বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-অক্টোবর। সাল-২০২৫

ডুব দে মন কালী বলে

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকের প্রাক্কালে মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি খুরেলসুখ উখনা-র সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দ।

সরকারি সফরে প্রথমবার ভারতে আসা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেইর স্টারমার-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের প্রাক্কালে ভারতে নিযুক্ত (মনোনীত) আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্জিয়ো গোর।

নয়াদিল্লিতে গান্ধীস্মৃতি ও বিজয়ঘাটে শ্রদ্ধেয় শ্রী মহাত্মা গান্ধী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
অক্টোবর সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

বাংলার শক্তি সাধনা ও বিপ্লবী সমাজ ৬
কৌশিক কর্মকার

খগেন মুর্মুর ওপর জিহাদি আক্রমণঃ হুঙ্কার নরেন্দ্র মোদীর ৯
জয়ন্ত গুহ

সরকার পাল্টে দিন বাংলায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করবঃ অমিত শাহ ১১
অভিরূপ ঘোষ

এসআইআর জুজুতে তৃণমূলের বিসর্জনের বাজনা ১৩
স্বাতী সেনাপতি

শতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ১৫
বিনয়ভূষণ দাশ

ছবিতে খবর ১৮

বল্লভ ভাই প্যাটেল: একতার ইস্পাতপুরুষ ২৪
সৌভিক দত্ত

পাকিস্তান বিরোধীতায় উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর ২৮
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

লাদাখের ভাড়াটে বাম বিপ্লবী সোনম ওয়াংচুক ৩১
দিব্যেন্দু দালাল

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

ক্ষমতায় আছে কিন্তু সন্ত্রাস চালানোর মত আর কোনও ক্ষমতা নেই তৃণমূলের। বিজেপি তো দূরের কথা। বাংলা ভাষায় খবর করা ইউটিউবার-দের বিরুদ্ধেও সন্ত্রাস চালানোর ক্ষমতায় নেই তৃণমূল। সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওপর প্রাণঘাতী হামলাই এখনও পর্যন্ত তৃণমূল জিহাদি বাহিনীর শেষ সন্ত্রাস।

খাঁচায় বন্দী এখন তৃণমূল, তৃণমূলের 'ভয় দেখানো'-র মেশিনারি এবং তৃণমূলের জিহাদি বাহিনী। খাঁচার ভিতর থেকে প্রবল হুমকিহামকা কিন্তু সব হুমকিই আসলে ন্যাতানো পাঁপড় হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে নাগরাকাটা থেকে নদিয়া এবং মালদা থেকে শ্রীরামপুরের রাস্তায়। নাগরাকাটায় দেশের সাংসদ-বিধায়ক একই দিনে আক্রান্ত হবার পর, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজেজু-কে উত্তরবঙ্গে পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কারও হিম্মত হয়েছে কিরেন রিজেজুর দিকে একটা নুড়ি পাথর ছুঁড়ে মারতে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সেই নাগরাকাটাতেই আবার গিয়েছিলেন ত্রাণ নিয়ে। তারপর একের পর এক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিজেপি নেতারা ওই এলাকাতেই গিয়েছেন। দাপিয়ে বেড়িয়েছে। আক্রমণ তো দূরের কথা, তাঁদের বিরুদ্ধে ফু দেওয়ার সাহসও তৃণমূল দেখায়নি। কিন্তু বেড়েছে তৃণমূলের ভোকাল টনিকের ঝাঁজ। একসময়ে যা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচের আগে পিকে ব্যানার্জি দিতেন খেলায় জয় ছিনিয়ে আনতে, এখন সেটাই তৃণমূলী জিহাদিদের প্রধান অনুপ্রেরণা। 'খেলা হবে'-র একমাত্র প্রাণশক্তি। কিন্তু একটা বিষয় তৃণমূলের হাইকমান্ড কিছুতেই বুঝতে পারছে না, 'ভোকাল টনিক' আর কাজে দিচ্ছে না। মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না। অবশ্য বোঝার কথাও নয়। প্রবল প্রতাপশালী সিপিএম'ও কী বুঝেছিল ২০১১ সালে? বোঝেনি। বিসর্জনের আগে মানে যাওয়ার সময় হয়ে এলে 'বোঝেনা সে বোঝেনা'। হিটলার বা স্ট্যালিন, কেউই বোঝেনি।

তার মানে এটা নয় যে তৃণমূল প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে। রাজধর্ম পালন করবে এবার থেকে। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিরোধী দলকে সম্মান দেবে। দেশবিরোধী বা নৈরাজ্য তৈরি হতে পারে এমন কথা বলবে না। সংবিধান বিরোধী বা সমাজবিরোধী কোনও বক্তব্য বা কার্যকলাপ করবে না। করবে বা করে ফেলবে কেননা 'বিজেপি-কে লণ্ডভণ্ড' করতে গিয়ে নিজেরাই প্রতি মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তাল রাখতে পারছে না। মাথার ঠিক নেই। পচে গেছে মাথাটাই। পচন কখনও নিচুতলা থেকে শুরু হয়না। শুরু হয় মাথা থেকে। যত এগিয়ে আসবে এসআইআর এবং নির্বাচন, আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে মাথার পচন। ছড়িয়ে পড়বে গোটা শরীরে। আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে রাক্ষস বাহিনী। হুমকি একসময়ে পরিণত হবে আর্তনাদে। ঢিলও উড়ে আসবে। খাঁচার ভিতর থেকে। আইসিইউ-এর খাঁচার ভিতর থেকে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে বাংলায় ধর্মীয় ও সামাজিক বিভাজনের খাঁচা তৈরি করতে করতে নিজের অজান্তেই খাচাবন্দী তৃণমূল। অপেক্ষা বিসর্জনের।

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

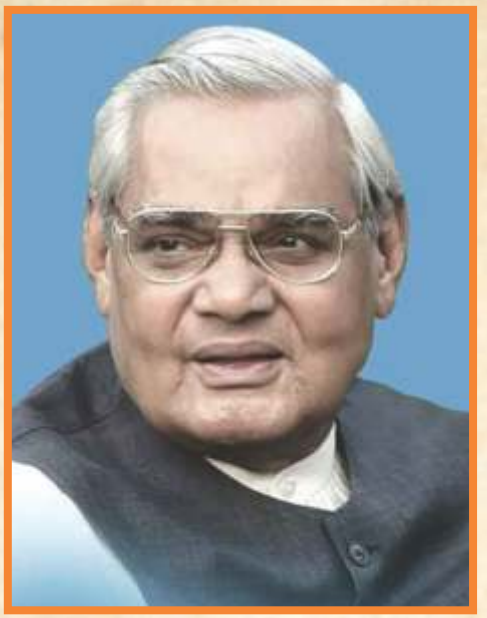

“সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত নির্যাসকে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বাজপেয়ী। হিন্দু ধর্ম নিয়ে এক প্রবন্ধে বাজপেয়ী লিখেছিলেন, “হিন্দুধর্মের প্রতি আমার আকর্ষণের প্রধান কারণ হল এটি মানবজাতির সর্বোচ্চ ধর্ম। হিন্দু ধর্ম কোন বইয়ের সাথে বা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচারকের সাথে যুক্ত নয়। হিন্দু ধর্মের রূপটি সর্বদা হিন্দু সমাজ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং এই কারণেই এটি অনাদিকাল থেকে ক্রমবর্ধমান এবং বিকাশ লাভ করে আসছে।”

তবে অস্পৃশ্যতা নিয়ে বরাবরই সরব ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। ১৯৬৮ সালে সংসদে এই সংক্রান্ত একটি আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, আমরা মানতে প্রস্তুত নই যে অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের একটি অংশ। অস্পৃশ্যতা একটি পাপ এবং একটি অভিশাপ। অস্পৃশ্যতা একটি কলঙ্ক। এই কলঙ্ক দূর না হওয়া পর্যন্ত, আমরা মাথা উঁচু করে বিশ্বের মুখোমুখি হতে পারব না।

ধর্মপালন নিয়েও তিনি একবার এক অকপট আলোচনায় বলেছিলেন, “আপনারা জানেন, আমার জীবনের প্রথম দিকে, আমি পৈতে পরিধান করতাম, কিন্তু যখন আমি নিজেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে নিবেদিত করি, তখন আমি এটি সরিয়ে দিয়েছিলাম কারণ আমি অনুভব করেছি যে এটি আমাকে অন্য হিন্দুদের থেকে আলাদা করেছে। আগে 'শিখা' এবং 'সূত্র' ছিল হিন্দুদের দুটি পরিচয়। বেশিরভাগ মানুষ শিখাকে আর রাখেন না। শিখা পালন না করে কেউ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছে এমন কথা বলা ভুল। হ্যাঁ, শিখা যখন জোর করে কাটা হয়, ধর্মীয় দমনের রূপক, তখন তা বন্ধ করা আমাদের কর্তব্য।”

"কবিতা পাঠ, গান, লেখালিখির পাশাপাশি খেলাধুলোর প্রতিও অমোঘ আকর্ষণ ছিল বাজপেয়ীর। সালটা ছিল ২০০৪। তখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বেই পাকিস্তান সফরে যাচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া। তো, পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে গোটা ভারতীয় ক্রিকেট দল দেখা করে। আর সেই সাক্ষাতেই বাজপেয়ী টিম ইন্ডিয়াকে এমন 'গুরুমন্ত্র' দিয়েছিলেন, যা আজও প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

অটল বিহারী বাজপেয়ী একটি ক্রিকেট ব্যাটে টিম ইন্ডিয়ার জন্য লিখে দিয়েছিলেন সেই 'গুরুমন্ত্র'। লেখা ছিল, 'শুধুমাত্র খেলাই নয়, হৃদয়ও জিতে এসো। শুভেচ্ছা রইল!'

সেইবার পাকিস্তান সফরে ৫ ম্যাচের একদিনের সিরিজে টিম ইন্ডিয়া ৩-২ ব্যবধানে জয়লাভ করে। আর টেস্ট সিরিজও জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে।"

বাংলার শক্তি সাধনা ও বিপ্লবী সমাজ

কৌশিক কর্মকার

"...আমরা কি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আরাধ্য দেবী কালী-র কথা স্মরণ করতে পারি না, তিনিই তো ভবানী- শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যাবতীয় শক্তির উৎস! সেই কালী যাঁর মধ্যে তিনি একাত্ম হয়ে যেতেন!' একুশ শতকের বাঙালিকে অনুধাবন করতে হবে শক্তির সাধনা, শক্তির চর্চা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের টইটুম্বুর জগৎ, তাঁর ভক্তির পরাকাষ্ঠা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে! তাই আসন্ন পক্ষই আমাদের শক্তি সাধনার সূচক বিন্দু হয়ে উঠুক।

'কালী- অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান- তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন- হায় মা!' ব্রহ্মচারীর বয়ানে বঙ্কিমচন্দ্র কালীর রূপ বর্ণনা করেছেন তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠে'র পৃষ্ঠায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লিখিত 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম উপন্যাসের আর এক চরিত্র ভবানন্দের বয়ানে সমকালীন সময়ের এক নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছিলেন, যা আজকের দিনেও তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছে: 'দেখ, যত দেশ আছে, - মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্দেশে মানুষ শিয়াল-কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?' শেষোক্ত প্রশ্নের মধ্যেই তার উত্তর স্পষ্ট ভাবে নিহিত। আজ,

বিপ্লবীদের শক্তি সাধনার কেন্দ্র পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির বড় কালী।

২০২৫ সালে রাজ্যবাসীর হয়তো খাদ্য নিরাপত্তা আছে; কিন্তু প্রাণের নিরাপত্তা? ধর্মাচরণের নিরাপত্তা? নারীদের নিরাপত্তা? সাম্প্রতিক অতীত জানাচ্ছে সবক'টি প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু নেতিবাচক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী মতাদর্শের পশ্চাতে মূল আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে 'আনন্দমঠ'; 'আনন্দমঠে'ই উচ্চারিত হয়েছিল সেই 'বন্দেমাতরম' বাণী, যা শাসক ইংরেজের হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছিল। বিপ্লবী সমাজের কাছে বেদগ্রন্থ ছিল 'আনন্দমঠ'। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে দেশের বিবিধ অঞ্চলের সাপেক্ষে বাংলার হীনাবস্থা তুলে ধরেছেন লেখক বঙ্কিম; যা বর্তমানের সাপেক্ষেও সমান সত্য; শিল্পশূন্য, উদ্যোগশূন্য, ভাতাসর্বস্ব এই রাজ্যের সার্বিক পরিবর্তনের স্বার্থে প্রয়োজন 'নেশাখোর নেড়েদের' সম্পূর্ণ বিতাড়ন। মা কালীর নামে দেশের বিপ্লবী সমাজ একত্রিত হয়েছিলেন; মা কালীর প্রতি একান্ত ভক্তিই তাঁদের এই পথে নিয়ে এসেছিল; ভক্তি যা কিনা আত্মত্যাগের চেয়েও গরিমাময় ও ঐশ্বর্যশালী; 'আনন্দমঠে'র উপক্রমণিকাতেই সেই 'ভক্তি'র জয়গান ধ্বনিত হয়েছে: 'তোমার পণ কি?/ পণ আমার জীবনসর্বস্ব।/ জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।/ আর কি আছে? আর কি দিব?/ ভক্তি।'

কেবল ভক্তি কি আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারবে? ভক্তিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন শক্তি; যার নিদারুণ অভাব অনুভব করেছিলেন ঋষি অরবিন্দ। 'আনন্দমঠে'র পাশাপাশি অপর যে গ্রন্থটি বিপ্লবী সমাজকে চূড়ান্ত সংগ্রামের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা হল ঋষি অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির'। 'ভবানী মন্দিরে'র পরিসরে অরবিন্দ খুব জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন 'শক্তি ছাড়া ভক্তি নির্জীব', তিনি আরও বলছেন 'জ্ঞানও শক্তির অভাবে মৃত'। তিনি বিশ্বাস করতেন 'বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity আছে, institution আছে, এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। ... এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, বীরশক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের আনন্দ ও ক্ষমতা যোটে, তা হলে

ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির।

বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে।' ('বাঙ্গালা ও সংস্কৃত রচনা'; Note on the Texts) এই বীরশক্তির অনুশীলন বিপ্লবীরা করেছিলেন কালীমায়ের সামনে; বিপ্লবীদের সাহস ও শক্তির উদ্যাপন ঘটতো কালীপূজার মধ্য দিয়ে। 'ভবানী মন্দিরে'র পাতায় অরবিন্দ জানাচ্ছেন, আমরা কোথা থেকে প্রেরণা পাব, আমরা কোন্‌পথ অনুসরণ করব? কে হবেন আমাদের আদর্শ? 'এই মহৎ- বলা উচিত সবচেয়ে মহৎ, সবথেকে বিস্ময়কর যে কর্তব্য, সে সম্বন্ধে আমরা উপদেশ পেয়েছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আর স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। তাঁদের নির্দেশিত পথে আমরা ঠিকমত অগ্রসর হইনি। ফলে আবার তামসিক মেঘে আবৃত হয়েছে আমাদের আত্মা, - ভয়, সন্দেহ, দ্বিধা, আলস্য আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। আমরা তাঁদের উপদেশ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ করেছি- কেউ গেছি ভক্তির পথে কেউ গেছি জ্ঞানের পথে, আমাদের শক্তিসাধন নেই। কর্মহীনতা আমাদের ভক্তিকে জীবন্ত করতে পারেনি। আমরা কি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আরাধ্য দেবী কালী-র কথা স্মরণ করতে পারি না, তিনিই তো ভবানী- শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যাবতীয় শক্তির উৎস! সেই কালী যাঁর মধ্যে তিনি একাত্ম হয়ে যেতেন!' একুশ শতকের বাঙালিকে অনুধাবন করতে হবে শক্তির সাধনা, শক্তির চর্চা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের টইটুম্বুর জগৎ, তাঁর ভক্তির পরাকাষ্ঠা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে! আসন্ন পক্ষ আমাদের শক্তি সাধনার সূচক বিন্দু হয়ে উঠুক, অশুভ শক্তির বিনাশে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের জন্য ব্রতী হয়ে উঠি।

এ কারণেই নির্ভীকতা ও বীরত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে কালী পূজা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্পিত সশস্ত্র বিপ্লবীসমাজের দীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে কোন বৃহৎ পরিকল্পনার শুভ সূচনা ঘটত কালীমায়ের বন্দনার মাধ্যমে। স্বদেশী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সমার্থক হয়ে আছে অনুশীলন সমিতির নাম। অনুশীলন সমিতির নতুন কোন সভ্যের দীক্ষাগ্রহণ বা প্রতিজ্ঞাকরণ অনুষ্ঠিত হত দেবী মন্দিরে, তা হতে পারে রমনা কালীবাড়ি বা সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত একটি গান এক্ষেত্রে উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য; যে গানটির মধ্য দিয়ে তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কালী বন্দনার সম্পৃক্ততা ঘোষিত হয়েছে উচ্চকণ্ঠে: 'শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা/ অভয়াচরণে নম্র শির।/ ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে/ দৃপ্ত আমরা ভক্ত বীর।/ আবাহন মার যুদ্ধ কারণে,/ তৃপ্তি তপ্ত রক্ত ক্ষরণে,/ পশুবল আর অসুর নিধনে/ মায়ের খড়্গ ব্যগ্র ধীর।/ মায়ের আরতি অরাতি নাশন,/ পদে অঞ্জলি বাঞ্ছা পূরণ/ শত্রুরক্তে মায়ের তর্পণ/ জবার বদলে ছিন্ন শির।।' বিপ্লবী সমাজের সাহস, শক্তি ও সর্বস্ব ত্যাগের আদর্শ ব্যঞ্জিত হয়েছে আলোচ্য গানটির মধ্য দিয়ে। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের আদর্শের সূত্রে; বঙ্কিম তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে'র

পঞ্চম অধ্যায় 'অনুশীলন' শীর্ষক অংশে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন: 'কিছুই ধর্ম্মছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য জীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না; এজন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দু ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ- সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?' বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেও দেখিয়েছেন অত্যাচারী মুসলিম শাসক রেজা খাঁর বিরুদ্ধে সন্তান দল অস্ত্র ধারণ করেছে। আনন্দমঠের আদর্শের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল অনুশীলন সমিতির সংবিধান। অনুশীলন সমিতির সদস্যদের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে কালীমায়ের উপাসনার ভূমিকা জানা যায় বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের অভিজ্ঞতা সূত্রে: 'পি মিত্র যে পদ্ধতিতে আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন গুপ্তচক্রের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে আমিও অনুরূপ পদ্ধতিতে আমার বাসায় দীক্ষা দিতাম। একসঙ্গে অনেককে দীক্ষা দিতে হইলে- ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে পুরাতন ও নির্জন 'সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে' যাইয়া একটু জাঁকজমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। অর্থাৎ সংযম উপবাস হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া শুদ্ধচিত্তে কালীমূর্তির নিকট আলীঢ়াসনে বসিয়া মস্তকে গীতা ও অসি ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতাম।' মাস্টারদা সূর্য সেনের সুযোগ্য ছাত্রী কুন্দপ্রভা সেনগুপ্ত তাঁর 'কারা স্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ভীষণাকার এক কালীমূর্তির সামনে নিজ রক্ত সমর্পণ করে তাঁদের প্রতিজ্ঞা নিতে হত। ভারত মায়ের বীর সন্তান ক্ষুদিরাম বসুও ফাঁসির পূর্বে চতুর্ভূজার প্রসাদ খেয়ে বধ্যভূমিতে যেতে চেয়েছিলেন। কেবল কালীবন্দনা বা কালীমায়ের পাদপদ্মে নিজের রক্ত সমর্পণ করে দলের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ নয়, মায়ের মন্দির ও ভক্তদের রক্ষা করাও স্বদেশী যুগে বিপ্লবীদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এমনই একটি ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন তাঁর গ্রন্থে: 'সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালীবাড়ী অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে, কোন এক তিথিতে (অমাবস্যা), সেখানে হাজার হাজার লোক পূজা দিতে আসে। এই পূজায় চার-পাঁচশ পাঁঠা এবং পাঁচ-সাতটা মহিষ বলি পড়ে। একবার গুজব রটিল যে, এই পূজার দিন মুসলমানেরা কালীবাড়িটি আক্রমণ করিবে। আমি মফঃস্বল সমিতির সম্পাদকগণকে সংবাদ দিলাম, সেইদিন প্রাতে লাঠিসহ সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। প্রায় পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক ঐ দিন উপস্থিত হইল। প্রথমে তাহাদিগকে 'কুচকাওয়াজ'

চিনিশপুর কালীবাড়ি।

করাইলাম, পরে যাত্রীদের সুবিধার জন্য তাহাদের নানা কাজে বিভক্ত করিয়া দিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই এবং যাত্রীরা সকলে বিদায় হইলে আমরাও প্রত্যাবর্তন করিলাম।' আলোচ্য ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা যায় বাংলার বিপ্লবীসমাজের কাছে শক্তি বন্দনা কি অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করেছিল!

কেবল অনুশীলন সমিতি নয়, যুগান্তর দল, সঞ্জীবনী সভাসহ সকল বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে কালীপূজার ইতিবৃত্ত। শুধু বিপ্লবী সমিতিগুলিই নয়, এই বাংলার যে সকল বীর সন্তান স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের কালী ভক্তির নিদর্শন আজও লোকমুখে ভীষণভাবে প্রচলিত। ১৯২৮ সালে সূচিত পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির বড় কালী পূজায় শক্তি সাধনা করতেন বাঘা যতীন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মত ব্যক্তিত্ব। বিশ শতকের গোড়ায় বাঁকুড়ার বড় কালীতলার রামদাস চক্রবর্তীর বাড়ির কালী পূজায় অবাধ আনাগোনা ছিল প্রফুল্ল চাকি, বীরেন ঘোষের মত বিপ্লবীরা। হাওড়ার বাগনানে কালী পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন বিপ্লবী বিভূতিভূষণ ঘোষ। পুরুলিয়ার এক কালী পূজায় বিপ্লবীদের ধরতে হামলা চালায় ব্রিটিশ পুলিশ, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় পাঁচ জন মানুষের। মেদিনীপুরেও রয়েছে এমন একাধিক কালী মন্দির যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিপ্লবীদের অনুষঙ্গ। বস্তুত সারা বাংলা জুড়ে এমন অজস্র কালীপূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিপ্লবী সমাজের শক্তি সাধনার ইতিহাস। বাংলার মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে কালী সাধনা, কোন বিজাতীয় মতাদর্শ এই অচ্ছেদ্য বন্ধনের মাঝে টিকতে পারবে না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়ং বেঙ্গল-এর সভ্যরা পশ্চিমি শিক্ষার গর্বে কালীকে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলে পরিহাস করেছিল। কিন্তু এই শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে রাজনারায়ণ বসুর মতো অনেকেই যৌবনের ভ্রম সংশোধন করে কালীর উপাসনায় মন দেন। সে কারণেই অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা মা কালীকে তাঁদের আদর্শের উদ্গাতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থ/সূত্র:

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ

২। শ্রীঅরবিন্দ, ভবানী মন্দির (অনুবাদ, সংকলন, সম্পাদনা: অচিন্ত্য বিশ্বাস)

৩। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

৪। শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি

৫। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, বাংলায় বিপ্লববাদ

৬। আনন্দবাজার পত্রিকা

৭। সংবাদ প্রতিদিন

৮। টিভি নাইন বাংলা

খগেন মুর্মুর ওপর জিহাদি আক্রমণ
হুঙ্কার নরেন্দ্র মোদীর

জয়ন্ত গুহ

আমরা যে রাজ্যে থাকি তা তো ভারতবর্ষের মধ্যেই পড়ে। এবং ভারতবর্ষ এক স্বাধীন রাষ্ট্র। তাহলে দুর্যোগের সময় একজন সহনাগরিককে সাহায্য করতে গিয়ে কেন নির্মম আক্রমণের মুখে পড়তে হবে দেশেরই আর এক নাগরিককে? রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকলেও এই প্রাণঘাতী আক্রমণ কেন হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে?

নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর-নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর গত ১০ বছর ধরে তৃণমূলের মাথামোটা হুব্বা বাহিনী বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখায়। ভয় না পেলে আক্রমণ করে এবং ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপি কর্মীদের রক্ত ঝরিয়ে বিজয়োল্লাস। কংগ্রেসের আদিম বর্বরতা এবং বাংলাদেশী জামাতি'র রক্তখেকো রাজনীতির এক অদ্ভুত মিশেল তৃণমূলের এই হুব্বা বাহিনী। কিন্তু গত ১০ বছরে দুটো জিনিস আমরা সাধারণত দেখিনি। এক, খগেন মুর্মু বা শঙ্কর ঘোষের মত কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ওপর প্রাণঘাতী হামলা। অনেকটা পাকিস্তানের মদতপুষ্ট বাংলাদেশী জামাতিদের যেমনটা দেখেছি রাস্তায় হাসিনা সরকার উৎখাতের সময়। দুই, হুব্বা বাহিনীর আক্রমণ এত আগে কেন? নির্বাচন ঘোষণার পর তো হবার কথা!

একুশে-র আগে থেকেই তৃণমূলের সংগঠন মূলত চালায় প্যাকপ্যাক ঢপের এজেন্সি। আর তৃণমূলের হুব্বা বাহিনীর কেউই সাধারণত বাংলার বাঙালী নয়। অধিকাংশই বাংলাদেশী অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গারা। ভিনরাজ্যে বাঙালী পরিচয় দিয়ে কাজ করে। এই ভোট মেশিনারি'কে ভোটের সময় খরচ করে বাংলায় নিয়ে আসে তৃণমূল। তেলঝোল নিয়ে অপারেশন শেষ করে আবার ফিরে যায় তারা ভিনরাজ্যে। দেশ জুড়ে তাড়া খেয়ে সেই বাহিনীর ৮০ শতাংশ এখন ফিরে এসেছে বাংলায়। তারাই কি খেপে গিয়ে প্রাণঘাতী আক্রমণ করল বাংলায় দেশের এক সাংসদ-বিধায়ককে নাকি তৃণমূলের দলীয় সংগঠনের রাশটাই চলে গেছে বাংলাদেশী জিহাদিদের হাতে?

যাই হোক না কেন একটা বিষয় পরিষ্কার তৃণমূল হিসাবে গোলমাল করে ফেলেছে বা তৃণমূলেরই জামাতি ভোট মেশিনারি তৃণমূলের হিসাব গণ্ডগোল করে দিয়েছে। সময়ের আগেই ঝোলার সাপ ঝোলা থেকে বার করে ফেলেছে। উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সেই দুর্যোগে ত্রাণ দিতে গিয়ে খগেন মুর্মু-শঙ্কর ঘোষের ওপর

প্রাণঘাতী হামলার পর গোটা দেশের পাশাপাশি উত্তবঙ্গের পাশে দাঁড়ান খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূলের প্রাণঘাতী হামলার নিন্দা জানিয়ে তিনি সমাজমাধ্যমে বলেন, "যেভাবে আমাদের দলের সহকর্মীরা- যাদের মধ্যে একজন বর্তমান সাংসদ ও বিধায়কও রয়েছেন—পশ্চিমবঙ্গে বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবা করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি তৃণমূল কংগ্রেসের অসংবেদনশীলতা এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার করুণ রূপের স্পষ্ট প্রতিফলন।

আমার একান্ত কামনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস এই কঠিন পরিস্থিতিতে হিংসায় লিপ্ত না হয়ে মানুষের সাহায্যে আরও মনোযোগী হোক। আমি বিজেপি কার্যকর্তাদের আহ্বান জানাই, তারা যেন জনগণের পাশে থেকে চলতি উদ্ধার কাজে সহায়তা করে যান।" নরেন্দ্র মোদীকে যে সাংবাদিকরা ২০১৪-র পর থেকে এখনও অবধি রোজ নজরে রাখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা চেনা নরেন্দ্র মোদী নয়। সাধারণত কোনও রাজ্যের কোনও ঘটনা নিয়েই তিনি সাধারণত সমাজমাধ্যমে (টুইট) পোস্ট করেন না। কিন্তু এবার তিনি করলেন। এবং তৃণমূলের নাম উল্লেখ করে, সাধারণত করেন না, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন।

মাত্র ৮ লাইনের পোষ্ট কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ওই পোস্ট, আঞ্চলিক দলের প্রবল প্রতাপশালী (হাবেভাবে) নেত্রীকে রাজধর্ম স্মরণ করাতে বাধ্য করেছে। হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন, দেশের অন্যতম সম্মানীয় সাংসদ খগেন মুর্মু-কে। যদি সহৃদয় হত সেই সাক্ষাৎ, সত্যিই সমবেদনা থাকতো তাহলে কারও কিছু বলার ছিলনা। কিন্তু একি! হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বলে দিলেন, " কানে একটু চোট লেগেছে!" খারাপ লেগেছে। উত্তরের মানুষের অবশ্যই খারাপ লেগেছে এই চাঁদ সদাগর মার্কা মা-মনসার পুজোয়।

স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের মনে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে। আমরা যে রাজ্যে থাকি তা তো ভারতবর্ষের মধ্যেই পড়ে। এবং ভারতবর্ষ এক স্বাধীন রাষ্ট্র। তাহলে দুর্যোগের সময় একজন সহনাগরিককে সাহায্য করতে গিয়ে কেন নির্মম আক্রমণের মুখে পড়তে হবে দেশেরই আর এক নাগরিককে? রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকলেও এই প্রাণঘাতী আক্রমণ কেন হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে?

যাই হোক প্রধানমন্ত্রীর ওই পোষ্ট'এর পর সব শুনশান। সবাই মনে করেছিল এ যাত্রায় তাহলে আর কিছু হবে না। সেই সবার ভাবনার ভুলে সম্ভবত তিনিও পড়লেন এবং যথারীতি ভুট-ভাট করে ভুটানের জল নিয়ে ভ্যাটভ্যাটে একটা গল্প সাজালেন। পাহাড়ে মায়াগ্রোভের চাষ প্রায় করেই ফেললেন। লোকজনের হাসির খোরাক হলেন। মাঝেমাঝেই হন। তাতে অসুবিধা ছিলনা কিন্তু তারপর তিনি সব সীমা অতিক্রম করে 'বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া'র নিদান দিলেন! সংবিধানকে সাক্ষী রেখে শপথ নেওয়া কোনও রাজ্যের কোনও মন্ত্রী এটা বলতে পারেন!

এরপর যদি দেশের সরকার দেশের স্বার্থে, আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে, পাহাড়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রাক্তন (আইপিএস) উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ কুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কি খুব ভুল করেছে?

সঙ্গেসঙ্গেই আপত্তি জানিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরী হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর ওই মাত্র ৮ লাইনের পোস্ট, ভয়ঙ্কর পোস্ট। বোঝা উচিৎ ছিল। সংযত হওয়া উচিৎ ছিল। হয়নি। বরং একের পর এক তৃণমূলের জনসভায় আমরা ভয়ঙ্কর হুমকির কথা শুনেছি। বিজেপি নেতাদের চোখ উপড়ে নেওয়ার হুমকি। বুথে ঢুকতে না দেওয়ার হুমকি। ফিনিশ করে দেওয়ার হুমকি। আরও কত কি! কেউ কেউ মনে করছিলেন, না না কিছুই হবেনা। সব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ মনে করছিলেন, কিছু না কিছু একটা হবে এবার।

এই কয়েকদিন আগেই সাংবাদিক আদিত্য রাজ কৌলের একটা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম। ওখানে উনি বলছিলেন, এই মুহূর্তে ভারত সরকার দেশের যে কোনও প্রান্তে যে কোনও অগনতান্ত্রিক কার্যকলাপকে নিমেষে স্তব্ধ করতে পারে। এর সঙ্গে শুধু ২টি লাইন জুড়ে দিতে চাই, বিনয়ের সঙ্গে। বিষধর সাপের ছোবল দেওয়ার ভাবনা ছোবলে পরিণত হবার আগেই তা নিউট্রালাইজ করার ক্ষমতা রাখে বর্তমান ভারত সরকার। কখন, কোথায়, কিভাবে- সেটা সিদ্ধান্তের বিষয়।

মনে হয়েছিল, বিহার নির্বাচন শেষ না হলে কিছু হবে না। অনেকেরই সম্ভবত কল্পনাতেও আসেনি। যেমন পাকিস্তানেরও কল্পনাতে ছিলনা কখন হবে চরম আঘাত।

একটা বিষয় খুব পরিষ্কার, সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে সম্মানীয় সাংসদ শ্রী খগেন মুর্মুর ওপর আক্রমণ আসলে বাংলার জনজাতি মানুষের ওপর তৃণমূলের জিহাদি আক্রমণ। এই আক্রমণ একেবারেই ভাল চোখে নেয়নি দেশের প্রধানমন্ত্রী। সংবিধানকে শপথ নিয়ে সরকার গঠন করা ভারত রাষ্ট্রের এক রাজ্য সরকারের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ছেলেখেলা ভালভাবে নেয়নি দেশের সরকার।

বাংলা নিয়ে এই মুহূর্তে মোদী-শাহ দুজনেই খুব শান্ত। প্রবল ঝড়ের আগে দুজনেই বরাবর খুব শান্ত থাকেন। তথ্য তো তাইই বলছে।

সরকার পাল্টে দিন

বাংলায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করবঃ অমিত শাহ

অভিরূপ ঘোষ

এটা তো অস্বীকার করা যাবেনা যে অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে জনবিন্যাস বদলে গেছে বাংলা, ঝাড়খণ্ড এবং আসামে। আর এই ৩ রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অবৈধ অনুপ্রবেশ হয়েছে বাংলায়। এটা ধারনা নয়, তথ্য। লোকসভায় দাঁড়িয়ে সেই তথ্য সবিস্তারে দিয়েছিলেন নিশিকান্ত ডুবে। পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এবার বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ- সরকার বদলে দিন, বাংলায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করব। তো অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে এত দরদ কীসের তৃণমূলের? কেনই বা এই দরদ?

খুব সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অমিত শাহের বক্তব্যে উঠে এসেছে এই অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ। দৈনিক জাগরণের ওই অনুষ্ঠান মঞ্চে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের অধিকাংশ ছিল মূলত অনুপ্রবেশ ঘিরে। তথ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দেন অনুপ্রবেশ কিভাবে রাষ্ট্র ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি করছে। তিনি বলেন ২০০১ থেকে ২০১১ অবধি দশ বছরে আসামের বেশ কিছু জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩০ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় এই সময়কালের জনসংখ্যা বেড়েছে চল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি। অনুপ্রবেশ ছাড়া এটা হতে পারে না।

স্বাধীনতার পর ভারতে প্রথম জনগণনা হয় ১৯৫১ সালে। ওই বছর ভারতে মোট জনসংখ্যার ৮৪.১% ছিল হিন্দু। অপরদিকে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৯.৮%। ২০১১ সালের শেষ জনগণনা অনুযায়ী ভারতে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হয়েছে ৫.১২ শতাংশ হারে (কমপক্ষে আড়াই তিন কোটি হিন্দু শরণার্থী প্রতিবেশী দেশে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসার পরেও)। অপরদিকে ওই একই সময়কালে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪৫.২১%। এখানে মাথায় রাখতে হবে এই তথ্য সবটাই ২০১১ সালের জনগণনার উপর ভিত্তি করে। বর্তমানে পরিস্থিতি আরো অনেকটাই খারাপ তা সহজেই অনুমেয়।

উল্টোদিকে প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং

পাকিস্তানের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমেছে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু ছিল সেখানের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। আজ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭.৯৫ শতাংশে। যেখানে ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম মেজরিটি জেলার সংখ্যা ৩৫ (২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে যে সংখ্যা অবধারিতভাবে আরো অনেকটাই বেড়েছে বলে মনে করে বিশেষজ্ঞ মহল), সেখানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা শূন্য। অবস্থা আরো খারাপ প্রতিবেশী পাকিস্তানে। ২০২৩ সালে তথ্য অনুযায়ী সেখানে হিন্দুর সংখ্যা মাত্র ২.১৭ শতাংশ।

সনাতনী হিন্দুদের পক্ষে ভয়ংকর বিপদজনক জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ বিবিধ। প্রথম কারণ অবশ্যই জন্মহার। গোটা দেশের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি। কোনো কোনো অঞ্চলে তা দুই বা তিনগুণেরও বেশি। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সবথেকে বেশি জন্মহার মুসলিমদের। ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সংখ্যাটা ২.৬৯। যেখানে বাকি বেশকিছু ধর্মের মানুষ সহ হিন্দুদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা দুইয়ের থেকে বেশ কিছুটা কম। তবে হিন্দুবিরোধী জনসংখ্যার এই ব্যাপক বৃদ্ধি কিন্তু শুধুমাত্র জন্ম হারের সাথে সম্পর্কিত নয়। এর মূল কারণ অবৈধ অনুপ্রবেশ। যেহেতু ২০১১ সালের পর পূর্ণাঙ্গ জনগণনার হয়নি তাই লোকসভা ভোট সম্পর্কিত একটি ছোট্ট তথ্য দিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

২০০৯ সালে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে জেতেন তৃণমূলের সোমেন মিত্র। সাড়ে পাঁচ লক্ষ চৌষট্টি হাজারের কিছু বেশি ভোট পান তিনি। ২০১৪ সালে ঐ লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হন অভিষেক ব্যানার্জি। পেয়েছিলেন ৫ লক্ষ ৮ হাজার মত ভোট। দুই ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিপিএমের ভোটের পরিমাণ চার লক্ষের কিছু বেশি। এরপর ২০১৯ সালে পুনরায় নির্বাচিত হন অভিষেক ব্যানার্জি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপি সেবার ভোট প্রায় চার লক্ষ সত্তর হাজার। তবে অস্বাভাবিকভাবে অভিষেক ব্যানার্জির ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ পৌঁছে যায়। ২০২৪ সালেও একই ঘটনা। বিরোধী ভোটের সংখ্যায় বিশেষ পরিবর্তন না হলেও যুবরাজ পেয়ে গেলেন প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ ভোট! অর্থাৎ মাত্র দশ বছরে ডবলেরও বেশি! এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যতই হোক না কেন অনুপ্রবেশ ছাড়া এই অস্বাভাবিকত্ব কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে সীমান্তে অনুপ্রবেশ আটকানো তো BSF এর কাজ যেটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতায় আসে। একদম ঠিক। কিন্তু ভারতের সাথে পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সীমান্ত কিছু কিছু জায়গায় নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ফেন্সিং করা বাস্তবে অসম্ভব। বহু কষ্টে ফেন্সিং করলেও প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। কোথাও তা বন্যার জলে ভেসে যায়, কোথাও মরুভূমির বালিতে ঢাকা পড়ে যায় আবার কোথাও ধস নেমে নষ্ট হয়ে যায়। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪০৯৬ কিলোমিটার। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ৩৩২৩ কিলোমিটার। এই ব্যাপক দৈর্ঘ্যের সীমান্তে দু-হাত ছাড়া ছাড়া BSF পোস্টিং করা বাস্তবে অসম্ভব। কিন্তু তবু চেষ্টা করা হয় এবং বহু অংশে অনুপ্রবেশ আটকানোও সম্ভব হয়। ঘটনা হলো ভারতের সংযুক্ত ব্যবস্থায় রাজ্যের সহায়তা ছাড়া অনুপ্রবেশের মত ঘটনা একশো শতাংশ আটকানো কোনোদিন সম্ভব নয়।

ব্যাপার হল একজন অনুপ্রবেশকারী সীমান্তে থাকা জওয়ানের চোখ এড়িয়ে ঢোকার পর সংশ্লিষ্ট গ্রামের লোকজন জানতে পারে না সেটা হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ পর্যন্ত, না বাম না তৃণমূল কোন সরকার এগুলো জেনেও কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে। নিদেনপক্ষে BSFকে জানানোর কাজটাও তারা করেনা। অবশ্য এটা তো অনেক দূরের কথা। সব জেনেও শুধু ভোটবাক্সের স্বার্থ আর পকেট ভরানোর তাগিদে অনুপ্রবেশকারীদের আধার কার্ড, জন্ম সার্টিফিকেট, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট সমেত সমস্ত নকল কাগজ তৈরি করে দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে পূর্বতন বাম সরকার একসময় যা করেছে আজ তৃণমূল বৃহত্তর রূপে সেই অন্যায় কাজ করে চলেছে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে গুজরাট,রাজস্থান, আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরার মত রাজ্যের সাথেও পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সীমান্ত আছে। কিন্তু সেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ হয় না বা হলেও স্থানীয় প্রশাসন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আটকে যায়। অনুপ্রবেশ হয় শুধু পাকিস্তান থেকে জম্মু-কাশ্মীরে এবং বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে। কেন? কারণ ওই দুই রাজ্যে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রবেশকারীদের সাথে।

আর সেই কারণেই, এসআইআর'এর প্রবল বিরোধিতা করছে তৃণমূল। এমন নয় দেশে এটা প্রথম এসআইআর। এর আগে অন্তত এগারোবার পূর্ণাঙ্গ এসআইআর হয়েছে দেশে। কিন্তু এই প্রথম এই ব্যাপক বিরোধিতা। কারণ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। ঠিকমত এসআইআর হয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকা থেকে বেরিয়ে গেলে তৃণমূলের হার ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। আর তাই অনুপ্রবেশকারী এবং নিজেদেরকে বাঁচাতে তৃণমূলের এই প্রবল বিরোধিতা।

পুনশ্চ:- ধর্মীয়ভাবে অত্যাচারিত হয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত হিন্দু,বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি ভারতে এসেছেন তারা সবাই এ দেশের স্বাভাবিক নাগরিক। অনুপ্রবেশকারী তারাই যারা ব্যবসায়িক কারণে বা অন্য কু-মতলবে অন্যায় পথে এদেশে এসে ভারতের ক্ষতিসাধন করছে।

এসআইআর জুজুতে
তৃণমূলের বিসর্জনের বাজনা

স্বাতী সেনাপতি

অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনবিন্যাস বদলে দেওয়ার ছক নতুন কিছু নয়। বহুদিনের ছক। ভারতবিরোধী আন্তর্জাতিক ছক। সেই ভারতবিরোধী ছকে'র অংশীদার বাংলার তৃণমূল। অবৈধ অনুপ্রবেশে জনবিন্যাস বদলে গেছে আসাম-বাংলা-ঝাড়খণ্ডের। আর এই তিন রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রবেশ হয়েছে বাংলায়। এই অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের নির্বাচন জেতার প্রাণভোমরা। ওরাই ইলেকশন মেশিনারি। ওরাই ভোটব্যাঙ্ক। এসআইআর-এ তাদের নাম বাদ যাবে ভোটার তালিকা থেকে। তো তাতে তৃণমূল চেঁচাবে না! তবে ওটা হুঙ্কার নয়, আর্তনাদ।

এসআইআরের বিরুদ্ধে নভেম্বর মাসে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা করতে চলেছে ভাইপো অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তাদের দাবি এসআইআর থেকে যাতে একটিও বৈধ নাম বাদ না যায়। এর আগে সময়কাল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে- শুরুর দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন, এসআইআর করতে গেলে নাকি তাঁর লাশের উপর দিয়ে করতে হবে! পরে তিনি বুঝতে পারেন এসআইআর হবেই। আর এটা বুঝতে পেরেই সুর নরম করেছে তৃণমূল। এখন মিনমিন করে তারা বলছে এসআইআর হোক কিন্তু কোনও বৈধ নাগরিকের নাম যেন বাদ না যায়। আসলে ভয় পেয়েছে তৃণমূল আর ভয় পাওয়ার একাধিক কারণও রয়েছে তাদের কাছে।

সাপের গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলে দিলে যেমন পিলপিল করে গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে আসে তেমনই এসআইআরের প্রসঙ্গ যবে থেকে সামনে এসেছে তৃণমূলের লাফালাফি শুরু হয়ে গেছে। এর কারণ বুঝতে গেলে আমাদের আগে বুঝতে হবে এই এসআইআরে ঠিক কাদের নাম বাদ যেতে চলেছে।

এসআইআরে স্ক্রুটিনিতে মূলত তিনটি বিষয় দেখা হবে। ২০০২ সালের পর যে সমস্ত ভোটার মারা গিয়েছেন তাদের নাম বাদ যাবে। বাদ যাবে সমস্ত ভোটার অন্য রাজ্যে গিয়ে পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গিয়েছেন বা অন্য দেশে চলে গিয়েছেন তাদের নামও। আর বাদ যাবে একই ব্যক্তির দুটি জায়গায় যদি দুটি আধার কার্ড থাকে সেরকম নামগুলি। এছাড়াও যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাদের পরিবারের মা বাবা বা অন্য কোন সদস্য ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিলেন না তাদেরও নাম বাদ যাবে।

২০০২ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় রাজনীতি করতেন। আর শেষবার মানে ২০০২ সালে যখন এসআইআর হয়েছিল তখন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাধা দেননি। কিন্তু এবার এত বাধা দিচ্ছেন কেন? তার কারণ একদিকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, অপরদিকে তেমনি ছাপ্পা ভোট। আপনাদের মনে আছে কিনা জানিনা, ২০১৮ সালে মারা যাওয়ার পর ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন প্রখ্যাত গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। যা নিয়ে মিডিয়ার বেশ হইচই হয়, তাদের পরিবারের লোকও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ বাস্তবে মৃত হলেও তার ভোট ভুয়ো ভোট হিসেবে তৃণমূলের খাতায় জমা হয়।

সম্প্রতি বিজ্ঞানভিত্তিক এক গবেষণাপত্রের স্টাডিতে দাবি করা হচ্ছে, বিশ্ব বাংলার ভোটার তালিকায় প্রায় ১৩.৬৯ শতাংশ জল!! সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪ লক্ষ!!

IIM কলকাতার দুই কৃতী ছাত্র গবেষণা করে এটা বের করেছেন। একজন অধ্যাপক, ডক্টর বিধু শেখর। IIT খড়গপুর, IIM জোকায় পড়াশুনো, গবেষণা শেষ করে বিধু এখন মুম্বইয়ে এস পি জৈন ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চে পড়াচ্ছেন। অন্যজন, অধ্যাপক, ডক্টর মিলন কুমার। ইনিও IIM জোকায় গবেষণা শেষ করে এখন IIM বিশাখাপট্টনমে পড়াচ্ছেন। এঁরা দুজনে মিলে এই গবেষণা চালিয়েছেন। আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে অঙ্ক মিলিয়েই এঁদের দাবি, বিশ্ব বাংলার ভোটার তালিকায় জল ১৩.৬৯ শতাংশ! মোট সংখ্যাটা ১ কোটি, ৪ লক্ষ!

এরা ২০০৪ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরেছেন। কারণ, ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা হয়েছিল। তারপর, তার ভিত্তিতেই ২০০৪ সালের ভোটার তালিকা তৈরি হয়। সেই তালিকাই ২০০৪ সালে লোকসভা ভোটে ব্যবহার করা হয়। সেই তালিকায় ভোটার ছিল, ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ। ২০০১ সালের জনগণনায় যে বয়সভিত্তিক তালিকা তৈরি করা হয়, দুই গবেষক ঠিক সেই সূত্র মেনেই ২০০৪ সালের ভোটার তালিকায় বয়সের ভাগাভাগি করে সংখ্যা নির্ধারণ করেন। এরপর বয়সভিত্তিক মৃত্যহারের হিসেব কষে বিধু এবং মিলন, ২০২৪ সালের সংখ্যা বের করেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ সালের ওই ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ, ২০২৪ সালে ৩ কোটি ৭৪ লক্ষে নেমে নেমে আসছে।

এবার দ্বিতীয় ধাপ। এবার প্রশ্ন হল ২০০৪ সালের পর কত নতুন ভোটার বাড়ল? বেষণাপত্রের হিসেব বলছে, ৩ কোটি ৯৪ হাজার নতুন ভোটার তালিকায় ঢুকতে পারে।

তাহলে হিসেব কী দাঁড়াল? ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ আর ৩ কোটি ৯৪ হাজার যোগ করলে কত? ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ মতো। দুই গবেষক এরপর পরিযায়ী শ্রমিক এবং প্রবাসীদের হিসেব কষেছেন। মোট ১৮ লক্ষ বাঙালি পাকাপাকি রাজ্য ছেড়েছেন বলে দুই গবেষকের মত। ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ থেকে তাহলে বাদ দিন ১৮ লক্ষ। কত হল? মোটামুটি ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ।

কিন্তু ???? ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ভোটার ৭ কোটি ৬১ লক্ষ !!!! অর্থাৎ, ১ কোটি ৪ লক্ষ ভোটার বেশি !!!! মানে, ভোটার তালিকায় ১৩.৬৯ শতাংশ জল। সাদা চোখ, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, কোনও হিসেবই মিলছে না। IIM কলকাতার এই দুই প্রাক্তনীর গবেষণালব্ধ অঙ্ক সঠিক ধরলে, এই ১ কোটিরও বেশি ভোটার হয় ভুয়ো না হলে, তারা এই দেশের নয়।

অতএব বোঝা যাচ্ছে তো কেন বাম তৃণমূল সহ সব রাজনৈতিক দলগুলি চাইছে যাতে ভোটার তালিকা সংশোধন না হয়। কারণ সংশোধন হলেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে আর গো হারা হারবে তৃণমূল। সেই সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক এবং অনুপ্রবেশকারী নিয়ে তৃণমূলের যে দাবিগুলি থাকে সেগুলি নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং পাকাপাকিভাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে অনুপ্রবেশকারীরা। আর ২০২৬ এর আগে যেদিকটা একেবারেই নিতে রাজি নয় তৃণমূল।

শতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিনয়ভূষণ দাশ

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের বিজয়া দশমীর পবিত্র দিনে নাগপুর শহরে কয়েকজন যুবক এবং প্রৌঢ় মিলিত হয়ে একটি সর্বভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছরের ২ অক্টোবর সেদিনে অঙ্কুরিত প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিটি শাখায় এই শতবর্ষ পূর্তির দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এই শতবর্ষ পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর্তা শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১০০ টাকার মুল্যের স্মারকমুদ্রা ও একটি পোস্টাল ষ্ট্যাম্পের প্রকাশ করেছেন। এই মুদ্রার একদিকে লিপিবদ্ধ রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের আদর্শবানী বা সুত্র 'রাষ্ট্রায় স্বাহা, ইদং রাষ্ট্রায় ইদং ন মমঃ', অর্থাৎ, আমি নিজেকে সমর্পণ করছি এই জাতির কল্যাণে, নিজের জন্য নয়। এই নীতিবাক্যটি সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরের দীনদয়াল উপাধ্যায় রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর উদ্বোধনের সময়ে হোম করার প্রতিকৃতির নিচে উল্লিখিত ছিল। যাইহোক, এই উপলক্ষ্যে শ্রী মোদী কম্যুনিস্ট ও তাঁদের সহযোগী কিছু সদস্য এবং উগ্র ইসলামপন্থীদের বিদ্ধ করে বলেছেন, এই একশত বৎসরে সঙ্ঘ ধারাবাহিকভাবে একটি আদর্শ সামনে রেখে উত্তরণের পথে এগিয়ে গিয়েছে। কয়েকবার সাময়িক নিষেধাজ্ঞা সত্বেও তার গতি রুদ্ধ করতে পারেনি সঙ্ঘবিরোধী শক্তি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রায় একই সময়ে ভারতে মার্ক্সবাদী ধারনায় অনুপ্রাণিত কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দেই (যদিও বাস্তব সত্য হল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখণ্ডে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)। কিন্তু একসময়ে ভারতের কিছু অঞ্চল, যেমন কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, তেলেঙ্গানা, পাঞ্জাব এবং বিহারের কিছু অংশে তাঁদের কিছু প্রভাবক্ষেত্র থাকলেও আজকের ভারতে তাঁদের শেষ আশ্রয়স্থল হয়েছে কেরালা; সেখানেও তাঁরা টিমটিম করে জ্বলছে মাত্র! অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে; দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও তার প্রসার ক্রমবর্ধমান। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বেশীরভাগ রাজ্যে আজ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা সরকার পরিচালনা করছেন। দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, বন্যায়, যুদ্ধ চলাকালে সব সময়ই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা প্রথমে সামনে এসে নিঃস্বার্থভাবে সেবা কার্যে নেমেছেন।

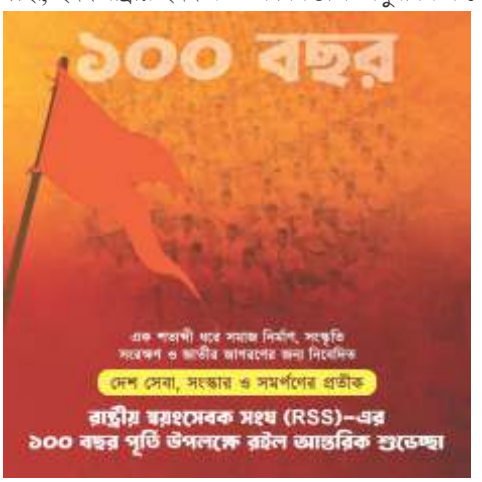

সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই ঘূর্ণাবর্তের অশান্ত সময়ে। দেশপ্রেমের এক মহান আদর্শকে সামনে রেখে হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করার লক্ষ্যে কয়েকজন আদর্শপ্রেমী, স্বাধীনতা সংগ্রামী একত্রিত হয়েছিলেন এই লক্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যে কারণগুলির জন্য আমাদের দেশ বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে; প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বিদেশী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সত্বেও শেষে পরাজিত হয়েছে, ডাক্তারজী সেই কারণগুলি অনুধাবন করে তা দূর করে এক শক্তিশালী, বৈভবময় ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর অনুগামীরা কখনও দাবী করেননি যে তাঁরা কোন নতুন কাজ করছেন, পরন্তু তাঁরা দেশের চিরন্তন মূল্যবোধের সাহায্যেই সমসাময়িক সমস্যার সমাধান করার পথনির্দেশ করেছিলেন। জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে সঙ্ঘ সমগ্র সমাজকে 'সংহত' করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘের প্রথম যুগের প্রচারকদের মধ্যে ছিলেন দাদারাও পরমার্থ, মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরস (বালাসাহেব দেওরস), মুরলীধর দত্তাত্রেয় দেওরস (ভাওরাও দেওরস), যাদবরাও জোশী, একনাথ রানাডে প্রমুখ কার্যকর্তাগণ।

বাস্তবে সঙ্ঘ অতীত থেকে শুরু করে, বর্তমান সময়ের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। আর এই সব কাজ সঙ্ঘ করে চলেছে সারা দেশে পরিব্যপ্ত ৮৩, ১২৯টি দৈনিক নিয়মিত শাখা যা ছড়িয়ে রয়েছে ৫১, ৭৪০টি স্থানে। তাছাড়া রয়েছে ছাব্বিশ হাজার চারশো ষাটটি স্থানে বত্রিশ হাজার একশ সাতচল্লিশটি সাপ্তাহিক সম্মেলন বা মিলন কেন্দ্র। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। পূজনীয় ডাক্তারজীর গৃহে যে সংগঠন অঙ্কুরিত হয়েছিল তা আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আজ সঙ্ঘ শুধু একটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনই নয়, তা আজ এক বিশ্বব্যাপী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। আজ সঙ্ঘ' কৃন্বন্ত বিশ্বম্ আর্যম্' এর মহান ব্রত নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বকে সুসংস্কৃত করার মহান লক্ষ্যে সঙ্ঘ আজ কাজ করে চলেছে শতবর্ষ অতিক্রম করার পরেও। এছাড়া সঙ্ঘ তার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন

পথ চলার শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত সঙ্ঘের ৬ সরসঙ্ঘচালক।

সংগঠন যেমন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি, বিদ্যাভারতী, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিবেকানন্দ কেন্দ্র, সেবা ভারতী, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ইত্যাদি আরও নানান সংগঠনের মাধ্যমে দেশ ও দেশের মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। আর এই সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা করে কুশলী নেতৃত্বদান করে সংগঠনগুলিকে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছেন সঙ্ঘের অভিজ্ঞ প্রচারকবর্গ; দত্তপন্থ ঠেংড়ী, যশবন্তরাও কেলকর, বালাসাহেব দেশপান্ডে, একনাথ রানাডে, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং দাদাসাহেব আপ্তের মত কুশলী সংগঠকগণ। এছাড়া রয়েছেন মউসীজী কেলকর ও প্রমীলা তাই মেধে। এনারা সবাই সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের বিভিন্ন অংশের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।

১৯২৫-এর ওই বিজয়া দশমীর দিনে কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে ফেরা কেশবরাও বলিরামপন্থ হেডগেওয়ার তাঁর নিজের বাড়িতে আরও পনের-কুড়ি জন সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিকে একত্র করে তাঁদের সামনে নিজের সংকল্প ব্যক্ত করে বললেন, " আজ থেকে আমরা সঙ্ঘ শুরু করছি।" প্রথম দিনের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সামাজিক কার্যকর্তা শ্রীবিশ্বনাথরাও কেলকর, শ্রীভাউজী ক্যবরে, শ্রীআন্না সোহোনী, শ্রীবালাজী হুদ্দার, শ্রীবাপুরাও ভেদী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এঁদের প্রায় সবাই ডাক্তারজীর বাল্যবন্ধু ছিলেন। ডাক্তার কেশবরাও হেডগেওয়ার সঙ্ঘের শুভারম্ভ ঘোষণা করে উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সঙ্ঘে প্রত্যক্ষ কি কার্যক্রম করা যায় যাতে আমরা ঘোষণা করতে পারি যে সঙ্ঘ শুরু হয়ে গেছে?' তিনি উপস্থিত সকলের মতামত শুনলেন এবং উদ্দীপ্ত ভাষায় তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বললেন যে, সঙ্ঘের কার্যক্রমে থাকবে থাকবে তিন ধরণের শিক্ষাগ্রহণ করা- শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং সামরিক। প্রতিষ্ঠার দিনে সঙ্ঘের বীজমন্ত্ররূপে দুটি আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমত, হিন্দুরাষ্ট্রের পুনরুত্থান এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেদের জীবনে চারিত্র্য, ধ্যেয়নিষ্ঠা এবং সেবাময় জীবন। ডাক্তারজির ধ্যেয় ছিল, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে আদর্শনিষ্ঠ যুবকদের সাহায্যে সমস্ত দেশে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা, জাতি নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৈভবশালী ভারত নির্মাণ করা।

অবশ্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আগে ডাক্তারজী সেই সময়ের অনেক হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বাতন্ত্রবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর , স্বামী সত্যদেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ডাক্তারজী মনে করতেন, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজ, স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি সংস্থা হিন্দু সমাজের মধ্যে কুপ্রথা দূর করে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কাজের ক্ষেত্র ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই প্রথম থেকেই ডাক্তারজী একটি সর্বভারতীয় সংগঠন নির্মাণে নিয়োজিত হন। তিনি জানতেন, স্বামী বিবেকানন্দ, বাল গঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ, লালা লাজপত রাই, বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু এঁরা সকলেই হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ভারতীয় জাতিকে সব সঙ্কীর্ণতা, ভাষা এবং আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে বলে মনে করতেন।

তাঁর পরিকল্পিত এই 'মিশন'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর সংস্পর্শে আসা তরুণ ও বালকদের বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি 'শাখা' পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই শাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকগণ ও বালকদের তিনি শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে

তিনি প্রশিক্ষিত সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম দিকে বিভিন্ন বর্গের মাধ্যমে তিনি তাঁদের প্রশিক্ষিত করতেন। এই বর্গগুলিতে প্রশিক্ষণ দান করতেন তিনি নিজে এবং শ্রীবডকস, শ্রীটালাটুঁলে, শ্রীমার্তণ্ডরাও যোগ,দাদা পরমার্থ, বালাজী হুদ্দার, ভাইয়াজি দানী প্রভৃতি প্রমুখগণ। এই বর্গই পরবর্তীকালে 'বৌদ্ধিক বর্গ' বলে পরিচিত হয়।

আর সেই সময় সঙ্ঘের তরুণ এবং বালকেরা শ্রীআন্না খোটের নাগপুর ব্যায়ামশালায় যেত শারীরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য। সঙ্ঘের সদস্যরা ওই ব্যায়ামশালায় দণ্ড, ডন-বৈঠক, মলখম্ভ, একদণ্ডী , দ্বিদণ্ডী ইত্যাদি কার্যক্রম করত। এছাড়া প্রথমদিকে রাজা লক্ষণরাও ভোঁসলের প্রাপ্ত দানের অর্থ দিয়ে ডাক্তারজী 'মহারাষ্ট্র ব্যায়ামশালা' এবং 'প্রতাপ আখড়া' নামে দুটি আলাদা ব্যায়ামশালা নির্মাণ করেন। স্বয়ংসেবকেরা সেখানেই যেতে শুরু করে। এইভাবেই সঙ্ঘের প্রাথমিক যুগের কার্যক্রম হত। বস্তুত সঙ্ঘের বাইরের রূপটি ছিল আখড়ার মত। হয়ত ডাক্তারজী কলকাতায় অবস্থানকালে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই আখড়ার ধারনাটি তাঁর মাথায় এসেছিল।

একসময়ে সঙ্ঘের নামকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তিনটি নাম আলোচিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, জরিপটকা মণ্ডল এবং ভারতোদ্ধারক মণ্ডল। অনেক আলাপ আলোচনার পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামটিই গৃহীত হয়। অনেক চিন্তাভাবনার পরেই নামটি গৃহীত হয়। মানুষের ডাক্তার ডাক্তার হেডগেওয়ার রাষ্ট্রনির্মাণ এবং হিন্দু সমাজের ব্যাধি প্রতিকারে নিয়োজিত হলেন। হিন্দুত্বই যে রাষ্ট্রীয়ত্ব আরোগ্যপ্রদ এই বোধনির্মাণে তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করলেন।

যাইহোক, একটি প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সঙ্ঘের কাজের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি বিশেষ দিকের উল্লেখ মাত্র করা গেল। নিবন্ধের উপসংহারে কয়েকজন প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালকের বিশেষ কয়েকটি কাজের উল্লেখ করেই প্রবন্ধের উপসংহার টানবো।

আদ্য বা প্রথম সরসঙ্ঘচালক ডাঃ কেশবরাও বলিরাম হেডগেওয়ার: শ্রদ্ধেয় আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাক্তারজী স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে তরুণদের চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় পুনরুত্থান করে এক বৈভবশালী ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর বা শ্রীগুরুজী: শ্রীগুরুজী ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্তাব্দ অবধি ৩৩ বৎসর সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ছিলেন। তার সঙ্গে বাংলার বিশেষ যোগ ছিল। তিনি সারগাছির রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অখণ্ডানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং সেই সময়ে প্রায় ছয় মাস সারগাছিতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি ছিলেন সঙ্ঘের তাত্ত্বিক দার্শনিক। তিনি দেশভাগ ও স্বাধীনতার সময়, কাশ্মীরের ভারতভূক্তি এবং চিনের ভারতে আগ্রাসনের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন

করেন। তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন, ন হিন্দু পতিতো ভবেৎ , অর্থাৎ কোন হিন্দুই নিচু বা পতিত নয়, সমস্ত হিন্দু এক পরিবারভুক্ত। তিনি ১৯৩৯ সালে We or our nationhood defined এবং Bunch of Thoughts পুস্তক রচনা করেন।

তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক মধুকর দত্তাত্রেয় (বালাসাহেব) দেওরস: তাঁর সময়ে তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘের আদর্শ এবং শাখা বিস্তারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সঙ্ঘ কাজের বিস্তৃতি ঘটান। তিনি সামাজিক সংহতি বা সামাজিক সমরসতা প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশে সঙ্ঘের কাজ ছড়িয়ে দেন।

চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং (রজ্জু ভাইয়া) : তিনি ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী-অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান। তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী সি ভি রমনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন।

পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক শ্রীকুপ্পহল্লি সীতারামাইয়া সুদর্শন: সুদর্শনজী ছিলেন তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একজন প্রযুক্তিবিদ। স্বয়ংসেবকদের মধ্যে তিনি একাত্মতা স্তোত্র এবং একাত্মতা মন্ত্র জনপ্রিয় করে তোলেন। তাছাড়া তিনি সঙ্ঘের বুদ্ধিজীবী সংগঠন, প্রজ্ঞাপ্রবাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলির বিশেষ সমস্যা, বিশেষত খ্রিস্টান বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা এবং তার সমাধানের দিকনির্ণয় করেছিলেন।

আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস রাখি যে, আগামী দিনগুলিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার পঞ্চ পরিবর্তন- পর্যাবরণ সুররক্ষণ ও সংবর্ধন, কুটুম্ব প্রবোধন, স্ব-আধারিত জীবন, নাগরিক কর্তব্যবোধ এবং সামাজিক সংহতি বা সামাজিক সমরসতার পথে এগিয়ে বিশ্ব গুরুর স্থান গ্রহণ করবে।

ছবিতে খবর

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ আদিবাসী সমাজের ওপর, জল-জমি-জঙ্গল ও নারীদের ইজ্জত লুঠেরা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত বিজেপির প্রতিবাদ মিছিলে রাজ্য নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ সহ সকল স্তরের আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিগণ।

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলকাতার সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

মহাষষ্ঠী'র পুণ্যলগ্নে তারাপীঠে মা তারার বন্দনায় রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য্য সহ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও জেলা নেতৃত্ববৃন্দ।

মহাসপ্তমীর সকালে সকলের সাথে উৎসব ভাগ করে নিতে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

মহানবমীর সন্ধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গাপুজোয় মাতৃরূপ দর্শন করে স্থানীয় সহ-নাগরিকবৃন্দদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দুর্গাপূজায় উত্তর কলকাতার মানিকতলা বুক স্টলে, ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপত্র 'বঙ্গ কমলবার্তা' হাতে নিয়ে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ রাজ্য নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর

বোলপুরে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ সমীক্ষা বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডলের ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের ১৭১ নম্বর বুথে "পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই" কর্মসূচিতে বিধায়িকা শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল।

সাংসদ শ্রী খগেন মুর্মুর ওপর তৃণমূলের নৃশংস আক্রমণের প্রতিবাদে উত্তর কলকাতা যুব মোর্চার প্রতিবাদ মিছিলে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জি।

দুর্গাপুরে মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে শান্তিপুর থানায় প্রতিবাদী বিক্ষোভ সমাবেশ।

ময়নাগুড়ির রামসাই এলাকায় বন্যা দুর্গতদের জন্য ভরসা ও সহযোগিতা নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ।

সাংসদ শ্রী খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শ্রী শংকর ঘোষের ওপর তৃণমূলের প্রাণঘাতী আক্রমণের প্রতিবাদে এবং দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীর গণধর্ষণের বিরুদ্ধে বহরমপুর প্রশাসনিক দপ্তরে মহিলা মোর্চার ডেপুটেশন।

দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে বারাসাত মহিলা মোর্চার উদ্যোগে থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি।

দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে উত্তর কলকাতা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ট্যাংরা থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি।

দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে মেদিনীপুর বিধানসভায় মহিলা মোর্চার উদ্যোগে থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি।

দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে কালনা থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি।

দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলায় কাকদ্বীপ থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি।

দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার উদ্যোগে লালগোলা থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি।

উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের পাশে ভরসা-সহায়তা নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য ও বিজেপি নেতৃত্ব।

নাগরাকাটায় বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ দিতে গিয়ে তৃণমূলী জিহাদিদের হাতে প্রাণঘাতী হামলায় আক্রান্ত সাংসদ শ্রী খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শ্রী শঙ্কর ঘোষকে দেখতে হাসপাতালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

খাদ্য ও পানীয় জল, নিরাপদ আশ্রয়স্থল তৈরি করা এবং ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গত এলাকায় মানুষের পাশে বিজেপি'র বিধায়ক, সাংসদ এবং সম্মানীয় নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে ১৩ বছর বয়সি নাবালিকাকে ডালিম মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি ধর্ষণ করে। এই নির্মম ঘটনার পর নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে যান বিধায়ক শ্রী দীপক বর্মন ও ডঃ শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল। দোষীর যথাযথ শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ধরনের আইনি সহায়তা নিয়ে বিজেপি এই পরিবারের পাশে থাকবে। সেইসঙ্গে নির্যাতিতার পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্বও বিজেপি গ্রহণ করেছে।

উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে ভরসা ও সহায়তা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে ভরসা ও সহায়তা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ শ্রী রাজু বিস্তা।

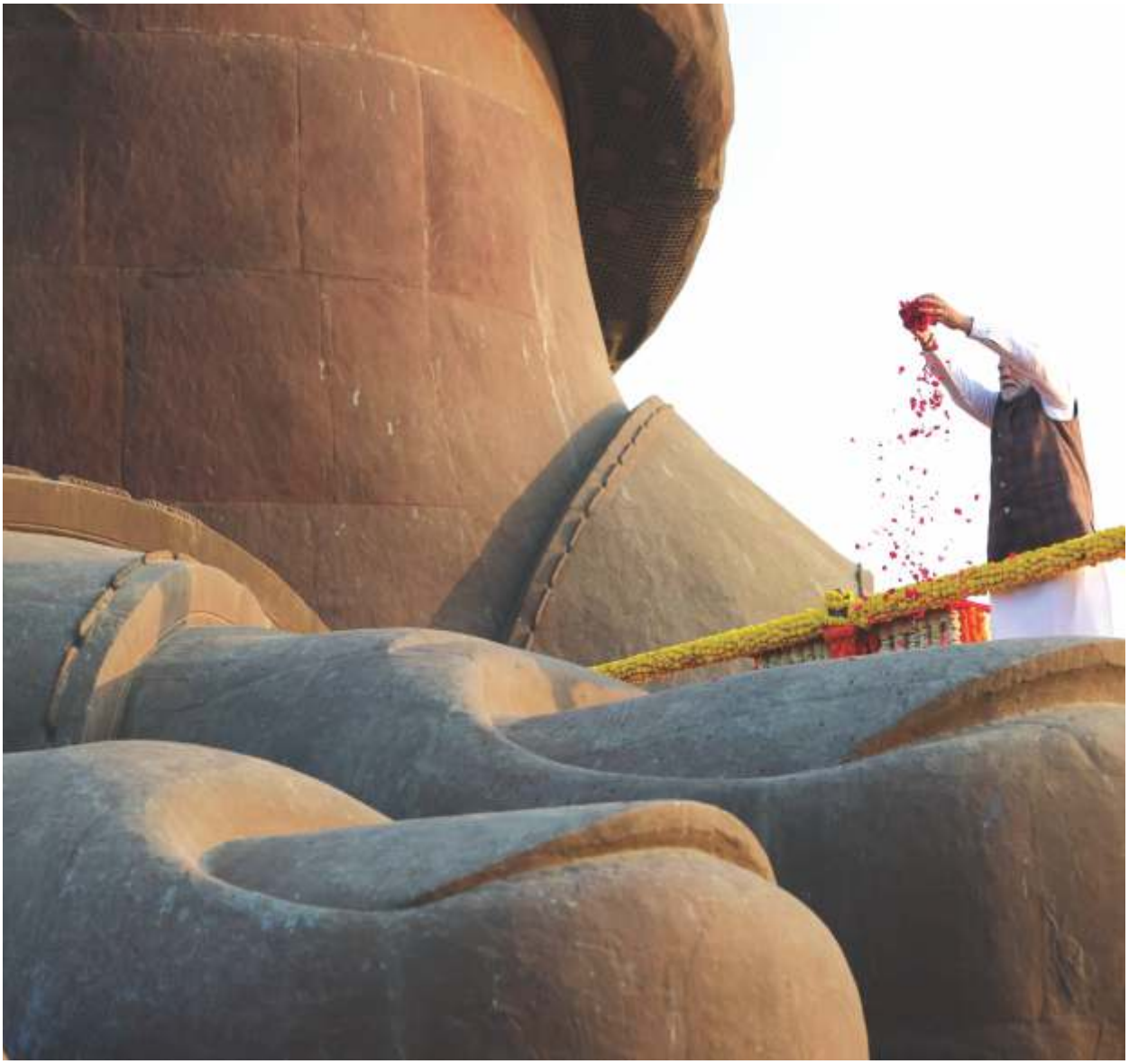

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

একতার ইস্পাতপুরুষ

সৌভিক দত্ত

প্যাটেল আমাদের সবাইকে একত্রিত করেছিলেন। আমাদের জাতীয়তাকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থাপন করেছিলেন। এখন আমাদের দায়িত্ব তার আদর্শকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার। প্রতিটি মানুষের মনে যদি একজন করে প্যাটেল জেগে ওঠেন, তাহলে দেশবিরোধী শক্তিগুলি কখনোই আমাদের আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এই বছরটা অর্থাৎ ২০২৫ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মের ১৫০ তম এবং মৃত্যুর ৭৫ তম বর্ষপূর্তি। আর প্যাটেল কেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ? উত্তর তো বলাই বাহুল্য!

প্রতিবাস্তব ইতিহাস চর্চা বলে একটি ধারা আছে। যেখানে যে ঘটনা ঘটেনি সেটা ঘটলে কী হত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার জিতে গেলে কী হতো, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা জিতে গেলে কী হতো ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমন একটি প্রতিবাস্তব ইতিহাস ভাবা যায় - যদি বল্লভ ভাই প্যাটেল না থাকতেন তাহলে কী হতো। উত্তরটা কিন্তু আমাদের জন্য মোটেও খুব একটা স্বস্তিদায়ক হবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বলকান অঞ্চলের যে অবস্থা হয়েছিল আমাদেও একই অবস্থা হতো যদি প্যাটেল না থাকতেন। ভারত বিভক্ত থাকত সাড়ে ৫০০র বেশি খন্ডে আর যুদ্ধ- লুটতরাজ হয়ে উঠতে এখানকার দৈনন্দিন দিনের বিষয়। নরক নেমে আসত উপমহাদেশের উপরে।

কিন্তু যে মানুষটা প্রায় একা হাতে ইতিহাসের গতিপথ একটি সুস্থ দিকে পরিচালনা করেছিলেন তিনি হলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। তিনি শুধু রাজ্যগুলিকে যুক্ত করেননি, তিনি একটি জাতিকে, একতার মনোবলকে, 'ভারত' নামের ধারণাটিকে সংহত করেছিলেন। এই কাজে এগোনোর সময়টা প্যাটেলের কাছে মোটেও সহজ ছিল না। ব্রিটিশ ভারত ইতিমধ্যে দুই খন্ডে বিভক্ত। শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান আর মুসলিম সহ সবার জন্য বাকি ভারত। ব্রিটিশরা ক্ষমতায় ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে হাতে করে তুলে দিচ্ছে ভারতের একখণ্ড কংগ্রেসকে আর অন্য খন্ড মুসলিম লীগকে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর এরই মধ্যে আছে সাড়ে ৫০০টা বেশি দেশীয় রাজ্য। যারা ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত হলেও সরাসরি ব্রিটিশ শাসনে ছিল না। তাদের সামনে যেকোনো একটি রাষ্ট্রে যুক্ত হওয়ার অপশন খুলে দেয় ব্রিটিশরা। এবং একই সাথে উপনিবেশিক কূটবুদ্ধি থেকে তাদের সামনে আরেকটি অপশন রাখে - স্বাধীন থাকার। আর বেশ কিছু দেশীয় রাজ্য এই প্রস্তাব পছন্দও করে।

আর এখান থেকে শুরু হয় প্যাটেলের আসল যাত্রা। ভারতের একত্রীকরণ। বর্তমান ভারত নির্মাণ।

ব্রিটিশ অফিসার আর কংগ্রেসী নেতারা বুঝতে পারে যে সেই মুহূর্তে প্যাটেল ছাড়া পুরো ভারতবর্ষে এমন কেউই ছিল না যে এতগুলো দেশীয় রাজ্যকে দৃঢ় হস্তে নিজের নিয়ন্ত্রনে আনতে পারবে। গান্ধী প্যাটেলকে বলেছিলেন, "দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা

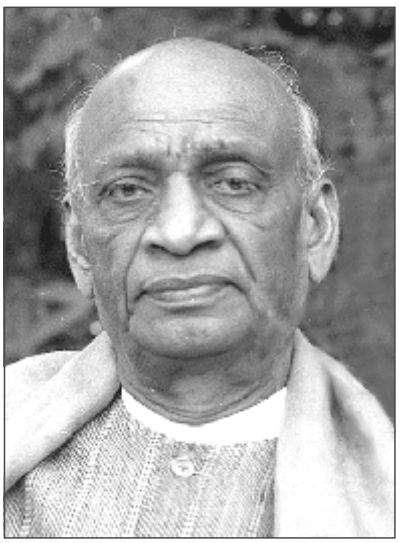

ভারতের লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

এতটাই কঠিন যে একমাত্র তুমি-ই এটি সমাধান করতে পারবে।" আর এই কাজে প্যাটেলের যোগ্য সহযোগী হয়ে ওঠেন . পি. মেনন।

১৯৪৭ সালের ৬ আগস্ট থেকে প্যাটেল দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন তাদের ভারতে আনার জন্য। প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা করে বৈঠক হয়। তিনি তাদের বাস্তব অবস্থা বোঝান যে এই অবস্থায় স্বাধীনতা বজায় রাখা তাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রায় বেশিরভাগ দেশীয় রাজ্যই নিজেরাই ভারতে যুক্ত হতে রাজি হয়ে যায়। কিছু কিছু রাজ্যকে অবশ্য বল প্রয়োগের হুমকি দিতে হয়েছিল বা লোভ দেখাতে হয়েছিল। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে রাজ্যগুলোকে সদিচ্ছার ভিত্তিতে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, এবং এর জন্য ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন, যাতে তারা ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন নথিতে স্বাক্ষর করে দেয়। মোট ৫৬৫টি রাজ্যের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর, জুনাগড় এবং হায়দ্রাবাদ ছাড়া বাকি সবগুলোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ হয়ে যায়। এদের মধ্যে জুনাগড় এর মুসলিম নবাব সরাসরি পাকিস্তানি যুক্ত হতে চেয়েছিল। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং চাইছিলেন স্বাধীন থাকতে আর হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বাধীন থাকতে চাইলেও তার ঝোঁক ছিল পাকিস্তানের প্রতি। আর এর মধ্যে জুনাগড় এ ছিল সেই ভারত সম্মান সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, যাকে ১৭ বার ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। এছাড়াও সৌরাষ্ট্রের উপকূল অঞ্চলের এই রাজ্য তার নিজের গুজরাটে ছিল।

জুনাগড়ের তৎকালীন নবাব মুহাম্মদ মহাবত খান পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিল জুনাগড়কে। এবং তাকে বুদ্ধি যোগাচ্ছিলো দেওয়ান শাহানাজ ভুট্টো। কিন্তু সেই রাজ্যের ৮০% জনসংখ্যাই ছিল হিন্দু পাকিস্তানের কোনো দাবি এখানে থাকতে পারে না। নবাব ও দেওয়ানের কার্যকলাপের কারণে জুনাগড়ের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করে। হিন্দুদের উপরে অত্যাচার শুরু হলে হিন্দুরাও পাল্টা বিদ্রোহ করে। এমন পরিস্থিতিতে দেওয়ান আর নবাব দুইজনেই পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনী জুনাগড়ে প্রবেশ করে শান্তিস্থাপনের জন্য জুনাগড়ের প্রশাসনিক অধিকার ও কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণে নেয়। পরে একটি গণভোটে জুনাগড়ের বেশিরভাগ নাগরিকরাই ভারতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে অফিশিয়াল ভাবে ভারতের অংশ হয়ে যায়।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে বল্লভভাই প্যাটেল।

জুনাগড় অধিগ্রহণের পর বাহাউদ্দিন কলেজে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় প্যাটেল হায়দ্রাবাদ কে কেন ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী সেই বিষয়ে তার মনোভাব তুলে ধরেন। হায়দ্রাবাদের ভারত তো অন্তর্ভুক্তি ছিল ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি হায়দ্রাবাদকে ভারতে না আনা যেত, তবে সেটা ভারতের জন্য এক স্থায়ী ক্যান্সার হয়ে থাকে যেত। যেটা কিছুটা হয়তো বাংলাদেশ হয়ে আছে।

হায়দরাবাদ ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়, এবং এর মধ্যে ছিল বর্তমান তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ। এর শাসক ছিল মুসলিম নিজাম, উসমান আলি খান, কিন্তু রাজ্যের ৮০% এরও বেশি মানুষ ছিলেন হিন্দু। নিজাম মুখে স্বাধীন থাকতে চাইলেও তার মনের ঝোঁক ছিল পাকিস্তানের প্রতি। নিজামের গোপন ইচ্ছা বুঝতে পেরে হায়দ্রাবাদের মধ্যে জন বিক্ষোভ শুরু হয়। নিজামের পোষা বাহিনী "রাজাকার" এই বিক্ষোভ দমনের জন্য প্রবল অত্যাচার শুরু করে হিন্দুদের উপর। অন্যদিকে নিজাম স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনসের অধীনে একটি স্বাধীন সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মর্যাদা গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করে ফেলে। জানা গেছে যে নিজাম পাকিস্তান এবং গোয়া (তৎকালীন পর্তুগিজ শাসন) থেকে অস্ত্র সরবরাহ পেয়েছিল। এছাড়াও, অস্ট্রেলিয়ান অস্ত্র ব্যবসায়ী সিডনি কটনের কাছ থেকে বিমান থেকে ড্রপ করে অতিরিক্ত অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল।

এই হায়দ্রাবাদ প্রসঙ্গে প্যাটেলের সঙ্গে নেহেরুর আদর্শিক মতবিরোধ আবার একবার সামনে চলে আসে। লেখক এজি নূরানী এর মতে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উদ্বেগ ছিল হায়দ্রাবাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্যোগকে পরাজিত করা, কিন্তু তিনি আলোচনার পক্ষে ছিলেন এবং সামরিক বিকল্পকে শেষ অবলম্বন হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্দার প্যাটেল কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন এবং আলোচনার ব্যাপারে ধৈর্য ধরেননি। নূরানী বলেন, "প্যাটেল ব্যক্তিগতভাবে নিজামকে ঘৃণা করতেন।"

যাইহোক, ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মের সময় প্যাটেল চাচ্ছিলেন হায়দ্রাবাদে হস্তক্ষেপ করতে। তবে শেষ পর্যন্ত ১৩ সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদে ভারতের সামরিক অভিযান শুরু হয়। রাজাকারদের পরাজয়ের পর নিজাম "ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন" স্বাক্ষর করে আর হায়দ্রাবাদ অফিসিয়াল ভাবে ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ওদিকে উত্তরে কাশ্মীরে গোলমাল পাকিয়ে বসেছিল রাজা হরি সিং। কাশ্মীরের মত ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন থাকতে, যেটা কিনা প্র্যাকটিক্যালি অসম্ভব। কিন্তু তিনি তার জেদ বজায় রাখেন। এদিকে কাশ্মীরে অভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে শুরু হয়। নেহেরুর বন্ধু বলে পরিচিত শেখ আব্দুল্লাহর ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে পুঞ্চে একটি বিদ্রোহ শুরু হয়। এবং ক্রমশত স্থানে হিন্দুদের হত্যা ও ঘর ছাড়া করার দাঙ্গায় পরিণত হয়। এই ঘটনায় হরি সিংকে বুঝিয়ে দেয় যে কাশ্মীর স্বাধীন থাকা মানে একদিন না একদিন পাকিস্তানে পরিণত হওয়া। এই সময় থেকে তিনি ভারতের দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয় ডাকাতদের ছদ্মবেশে পাকিস্তানী বাহিনী কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝতে পেরে হরি সিং ভারতের সাহায্য চান। হরি সিং কে ভারত ভুক্তির চুক্তিতে সই করিয়ে নিয়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে আইন মেনে ভারত কাশ্মীরে সৈন্য পাঠায়। প্রবল বিক্রমে এগিয়ে চলছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কিন্তু দুঃখজনকভাবে যখন কাশ্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তানের থেকে মুক্ত করতে বাকি, সেই সময় নেহেরু পুরো বিষয়টি প্যাটেলের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের হাতে তুলে দেন। যার ফলাফল আজও কাশ্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থেকে গেছে। এবং সেখানে তাকে জঙ্গিতে আস্তানা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্যাটেল আমাদের সবাইকে একত্রিত করেছিলেন। আমাদের জাতীয়তাকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থাপন করেছিলেন। এখন আমাদের দায়িত্ব তার আদর্শকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার। প্রতিটি মানুষের মনে যদি একজন করে প্যাটেল জেগে ওঠেন, তাহলে দেশবিরোধী শক্তিগুলি কখনোই আমাদের আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

TATA থেকে Google

বিনিয়োগের মানচিত্রে নেই পশ্চিমবঙ্গ!

অন্ধ্রপ্রদেশ

এই সময় অনলাইন

ভারতে ১৫০০ কোটি US ডলার বিনিয়োগ Google-এর, বিশাখাপত্তনমের ডেটা সেন্টার নিয়ে মুখ খুললেন সুন্দর পিচাই

১৫০০ কোটি ডলার
বিনিয়োগ
নতুন কর্মসংস্থানের খোঁজ

পশ্চিমবঙ্গ

আনন্দবাজার.com

শ্রমিক ছাঁটাই থেকে বন্ধ কারখানা, সরব নেতারা

বিনিয়োগ দূরস্ত,
কারখানা বন্ধ
চাকরি নেই

/BJP4Bengal bjpbengal.org

তোলামূলী মমতা সরকারের জমানায়
শিল্প ও কর্মসংস্থানের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে রাজ্য

পাকিস্তান বিরোধীতায় উত্তাল

পাক অধিকৃত কাশ্মীর

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

যে অধিকৃত কাশ্মীরকে 'আজাদ-কাশ্মীর' বলেছিল পাকিস্তান সেই অবৈধ ভাবে দখলে থাকা কাশ্মীরই এখন পাকিস্তানের গলার কাঁটা। বিক্ষোভে জ্বলছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। প্রবল চাপে পাকিস্তান সরকার। চাপে পাক প্রধানমন্ত্রী শরিফ। পাক সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ, উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। এর পাশাপাশি মরক্কো সফরে গিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। তাঁর কথায়, "পাঁচ বছর আগে আমি কাশ্মীর উপত্যকায় ভারতীয় সেনার এক অনুষ্ঠানে বলেছিলাম পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করতে আমাদের আক্রমণ করার প্রয়োজন নেই। ওটা এমনিতেই আমাদের হবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরও বলবে, আমরা ভারতের অংশ। সেই দিন আসতে চলেছে।"

পাক সরকারের বিরুদ্ধে রাগে ফুঁসছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে তাঁরা। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটা সবথেকে বড় বিক্ষোভ বলে মনে করা হচ্ছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জেলায় বিক্ষোভ স্বাধীনতাকামীদের। সেখানে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক সংকট, মৌলিক পরিষেবার অভাব এবং পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সেখানকার মানুষজনের অভিযোগ, পিওকে-তে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। একাধিকবার সরকারকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। চরমে দুর্নীতিও। বাধ্য হয়েই তাই ধর্মঘট, চাক্কা জ্যামের মতো পদক্ষেপ করতে হয়েছে। আন্দোলনকারীদের নেতা শওকত নওয়াজ মীর বলেন, 'আমাদের আন্দোলন প্রতিষ্ঠানবিরোধী নয়। তা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য অধিকার আদায়ের লড়াই।'

গত ২৯ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)। সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ৩৮ দফা দাবি তুলে ধরেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের মূল দাবির মধ্যে রয়েছে— পাকিস্তানে বসবাসরত শরণার্থীদের জন্য পিওকে-তে বরাদ্দ ১২টি বিধানসভা আসন বাতিল করা, ময়দা ও বিদ্যুতের ওপর ভর্তুকি দেওয়া, করের ছাড় এবং অসমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে দ্রুত সম্পূর্ণ করা।

ক্রমে এই আন্দোলন সামরিক বাহিনীর অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলনের রূপ নেয়। সূত্রের খবর, মুজফফরাবাদ, রাওয়ালকোট, নীলম উপত্যকা ও কোটলিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, মুজফফরাবাদে পাকিস্তানি সেনারা গুলি চালিয়ে পাঁচজন আন্দোলনকারীকে হত্যা করে। ধীরকোটেও সেনার গুলিতে আরও পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

এই অশান্তি পাকিস্তানের দমনমূলক নীতির স্বাভাবিক পরিণতি।" তিনি বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের দমনমূলক নীতি এবং এই অঞ্চলগুলির সম্পদের সুসংগঠিত লুটপাটের ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি এখনও তারা জোরপূর্বক ও বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে। পাকিস্তানকে তার ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছে। তার ফলেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর তরফে পাক সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারত ফের একবার জানিয়ে দিয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরসহ গোটা জম্মু-কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদিকে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদে হিংসাত্মক বিক্ষোভের কয়েক দিনের ঘটনায় নিহতদের শেষযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। ভাইরাল হওয়া বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, বিপুল সংখ্যক মানুষ জানাজা ও সমাধির শোভাযাত্রায় অংশ নিতে জড়ো হয়েছে।

অব্যাহত বিক্ষোভ

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হওয়া এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে যখন পাক বাহিনীর গুলিতে তিন তরুণ নিহত হন। মুজাফফরাবাদে তাঁদের শেষযাত্রায় হাজারো মানুষের অংশগ্রহণ

জনরোষে আরও ইন্ধন জোগায়। জম্মু-কাশ্মীর যৌথ আওয়ামি অ্যাকশন কমিটির নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ একটি ৩৮ দফা দাবিসনদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক সংস্কার, ভর্তুকিযুক্ত গমের আটা সরবরাহ, বিদ্যুতের শুল্ক হ্রাস, বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দান এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বিশেষ সুবিধা বাতিলের দাবিও।

এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে মুজাফফরাবাদ। সেই আন্দোলন ইতিমধ্যেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। দোকানপাট, বাজার ও পরিবহণ পরিষেবা বন্ধ থাকায় জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পার্টির নেত্রী সৈয়দা জাহরা শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে বলেন, "কাশ্মীরের সুনামি আজ মুজাফফরাবাদকে আঘাত করবে।" তিনি একটি ভিডিও-ও শেয়ার করেন। তাতে বলা হয়েছিল যে পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের ওপর চালানো ব্যাপক হিংসার একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তবুও জনগণ পিছিয়ে যায়নি। আরও উল্লেখ করা হয়েছিল যে শুক্রবারের নামাজের পর জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। ওই ভিডিও ক্লিপে এও উল্লেখ করা হয়েছে, পাক সরকারের বিরুদ্ধে পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি ঘৃণা ক্রমেই বাড়ছে।

হিংসায় লাগাম টানতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একটি অসামরিক জোটের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়। পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হন। গুরুতর জখম হন বহু মানুষ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আট সদস্যের একটি কমিটি পাঠান। কমিটিতে রয়েছেন ফেডারেল মন্ত্রীরা আহসান ইকবাল, আমির মুকাম, সর্দার মুহাম্মদ ইউসুফ, রানা সানাউল্লাহ এবং তারিক ফজল চৌধুরি, পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা রাজা পারভেজ আশরাফ ও কামার জামান কাইরা এবং প্রাক্তন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট সর্দার মাসুদ খান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী আনোয়ারুল হকও।

অন্যদিকে, শোকসভায় সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেকেজেএসি-এর নেতা মির আন্দোলনের সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি অঙ্গীকার করেন, প্রধান দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে। তিনি বলেন, "এসব বিষয়ে আলোচনায় বসার আগে ধিরকোট-সহ অন্যান্য এলাকায় নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের হত্যায় দায়ীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে যে বিক্ষোভ চলছে, তা পাকিস্তানে দমন-পীড়ন নীতিরই পরিণতি, একথা বলেছে ভারত। ওই অঞ্চলে পাকিস্তানের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনাও করেছে নয়াদিল্লি। পাক সরকারের ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহির আহ্বানও জানিয়েছে ভারত সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "আমরা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভের খবর পেয়েছি, যেখানে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী নিরীহ অসামরিক নাগরিকদের ওপর নৃশংস অত্যাচার করছে।" এর পরেই তিনি বলেন, "এই অশান্তি পাকিস্তানের দমনমূলক নীতির স্বাভাবিক পরিণতি।" তিনি বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের দমনমূলক নীতি এবং এই অঞ্চলগুলির সম্পদের সুসংগঠিত লুটপাটের ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি এখনও তারা জোরপূর্বক ও বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে। পাকিস্তানকে তার ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।"

উত্তেজনার আশঙ্কায় বিপুল নিরাপত্তা মোতায়েন করে পাকিস্তান। মধ্য রাত থেকেই ইন্টারনেট কেটে দেয় পাক প্রশাসন। বিক্ষোভকারীদের রুখতে সেনার গাড়ি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের শহরগুলিতে টহল দেয়। পাঞ্জাব প্রদেশ থেকেও হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করা হয় পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। বাড়ানো হয় নজরদারি। উল্লেখ্য, গত বছর থেকেই পাকিস্তানের হাত থেকে নিষ্কৃতি চেয়ে সরব হয়েছে পিওকে। চলতি মাসেই মরোক্কোতে গিয়ে পিওকে নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছিলেন, 'পিওকে ভারতের। পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে নিজের অংশ করতে কোনও আগ্রাসনের প্রয়োজন নেই। সেই অংশ একদিন নিজেই বলবে, আমরা ভারতের অংশ। স্থানীয়রাই স্বাধীনতার দাবি তুলেছে।' পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে রাজনাথের কথা মিলে যাচ্ছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।

লাদাখের ভাড়াটে বাম বিপ্লবী সোনম ওয়াংচুক

দিব্যেন্দু দালাল

জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হওয়া সোনম কি শুধুই এক পরিবেশ কর্মী নাকি সোনম-সিআইএ-র ফোর্ড ফাউন্ডেশন আর কংগ্রেসের মধ্যে বিশেষ সংযোগ রয়েছে? গান্ধী পরিবার ঘনিষ্ঠ সোনম কি নিতান্ত একজন শিক্ষা সংস্কারক নাকি লাদাখে ভারত বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত কোনও বিদেশী সংস্থার ভারতীয় অ্যাসেট?

মিডিয়ার প্রচারণা অনুযায়ী সোনম ওয়াংচুক একজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, উদ্ভাবক, শিক্ষা সংস্কারক ও জলবায়ু কর্মী। থ্রি ইডিয়টস ছবিটা নাকি তাঁর জীবনের উপর ভিত্তি করে বানানো, এরকম একটা প্রচার চালানো হয়েছিল। এই প্রচারে সোনম হয়তো বেশ কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, কিন্তু মিডিয়া আপনাকে যেগুলো জানায়নি সেগুলো এখানে বলবো।

থ্রি ইডিয়টস-এ আপনাকে বলা হয়েছিল যে র‍্যাঞ্চো একজন গরিব মালী-র ছেলে। কিন্তু বাস্তবে সোনম ওয়াংচুক অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান পরিবার থেকে এসেছেন। তাঁর বাবা সোনম ওয়াংগিয়াল ছিলেন কংগ্রেস নেতা এবং জম্মু-কাশ্মীর সরকারের মন্ত্রী। ১৯৮৮ সালে তিনি 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' শুরু করেন। ১৯৯৫ সালে শুরু করেন অপারেশন নিউ হোপ।

তাঁর সব প্রজেক্টের ফান্ডিং এসেছিল ফোর্ড ফাউন্ডেশন, টাটা ট্রাস্ট, ড্যান চার্চ এইড, করুণা ট্রাস্ট থেকে। সবসময় বিদেশি সংগঠনগুলির ব্যাপক সহায়তা তিনি পেয়েছেন।

কেন? চলুন দেখি—

আশির শেষ দিকে বা নব্বইয়ের শুরুতে তিনি একজন আমেরিকান মহিলা রেবেকা নরমান-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং ১৯৯৬ সালে বিয়ে করেন। কেন এই রেবেকার গল্প মিডিয়া থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা হয়েছে আমরা জানি না। তাঁরা এখনও বিবাহিত

আছেন কি না, তাও জানা যায় না। কিন্তু রেবেকার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই সোনমের জীবন বদলে যায়।

রেবেকা পড়াশোনা করেছেন School of International Training এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি-তে। SIT হলো একটি বেসরকারি নন-প্রফিট প্রতিষ্ঠান, যার সদর দফতর যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যাটলবরো-তে। এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে।

ফোর্ড ফাউন্ডেশন, জর্জ সোরস-এর OSF, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন দ্বারা এদের অর্থায়ন হয়।

রেবেকা বাইডেনের ঘনিষ্ঠ সমর্থক এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচক। রেবেকাকে বিয়ে করার পর সোনম হঠাৎ করেই বিদেশি সংগঠনগুলির ব্যাপক সহায়তা পেতে শুরু করেন। ২০০২ সালে তিনি আশোকা ফেলোশিপ পান যাকে অর্থায়ন করে স্কল ফাউন্ডেশন, শওয়াব ফাউন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন।

২০০৪ সালে মনমোহন সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। সোনম সবসময় কংগ্রেস পার্টির বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। তিনি

(বাঁদিকে) ইসলামাবাদে সোনম ওয়াংচুক। (ডানদিকে) বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সোনম ওয়াংচুক।

ছিলেন লাদাখ হিল কাউন্সিল ভিশন ডকুমেন্ট লাদাখ ২০২৫ এর খসড়া কমিটির সদস্য এবং শিক্ষা ও পর্যটন নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পান। ২০০৫ সালে মনমোহন সিং সেই ডকুমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

২০০৫ সালে সোনমকে মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষার ন্যাশনাল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য করা হয়।

২০০৭-২০১০ পর্যন্ত তিনি ড্যানিশ এনজিও Mellemfolkeligt Samvirk-এর শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন, যা শিক্ষা সংস্কারের জন্য ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করছিল।

এভাবে সোনিয়া গান্ধীর সরকার থেকে তিনি বহু পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন।

২০০৮ সালে কংগ্রেস চীনের সঙ্গে গোপন এমওইউ সই করে। একই সময়ে আমির খানের জনপ্রিয় মুভি ৩ ইডিয়টস আসে, যা চেতন ভগতের উপন্যাস ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান-এর উপর ভিত্তি করে। কিন্তু কিছুদিন পর মিডিয়ার একটি অংশ হঠাৎ করে এই মুভিকে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে যুক্ত করতে শুরু করে। সত্য হলো ৩ ইডিয়টস আর সোনমের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

সোনমের সেরা সময় শুরু হয় ২০১৬ থেকে। ২০১৬ সালে তিনি পান আন্তর্জাতিক ফ্রেড এম. প্যাকার্ড অ্যাওয়ার্ড, যা দেয় সুইজারল্যান্ডভিত্তিক International Union for Conservation of Nature। এই অ্যাওয়ার্ড অর্থায়ন করে রকফেলার, পিউ, প্যাকার্ড ফাউন্ডেশন।

২০১৭ সালে তিনি পান টিএন খোশু মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড, যা আবারও ফোর্ড ফাউন্ডেশন দ্বারা অর্থায়িত হয়।

২০১৮ সালে তিনি পান সবচেয়ে বড় পুরস্কার – ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড। আমরা আগেই প্রমাণ করেছি যে ম্যাগসেসে, ফোর্ড আর সিআইএ-র মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড বিশেষভাবে দেওয়া হয় সিআইএ-র অ্যাসেটদের।

সোনম যুক্ত আছেন এনজিও LEAD India-র সঙ্গে, যা আবারও ফোর্ড ফাউন্ডেশন দ্বারা অর্থায়িত।

সোনম যুক্ত আছেন International Association for Ladakh Studies-এর সঙ্গেও, যারা লাদাখের সংস্কৃতির উপর চার খণ্ডের একটি বই প্রকাশ করেছে। এই প্রজেক্টও অর্থায়ন করেছে ফোর্ড ফাউন্ডেশন। দেখা যাচ্ছে, সোনম, সিআইএ-র ফোর্ড ফাউন্ডেশন আর কংগ্রেসের মধ্যে বিশেষ সংযোগ রয়েছে।

একসময় তিনি ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু পরে তার বিরোধিতা শুরু করেন। পাকিস্তান তার বক্তব্য ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। তিনি নিজেকে জলবায়ু কর্মী ও শিক্ষা সংস্কারক বলেন। তার আইস স্তূপা প্রজেক্টকে পশ্চিমা মিডিয়া প্রশংসা করেছে, কিন্তু তার নিজের গ্রামবাসীরা এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

বর্তমানে তার দাবি—

১. লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (কিন্তু ষষ্ঠ তফসিল কেবল উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির জন্যই প্রযোজ্য)।

২. ভারতীয় সেনাবাহিনী লাদাখে নির্মাণকাজ বন্ধ করুক, কারণ এতে লাদাখের পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে।

সোনম ওয়াংচুক এবং ভারতে ইকো টেররিজমের আগমন

আপনি কি জানেন সোনম ওয়াংচুক এবং তার নন-প্রফিট SECMOL-কে সেই একই কাবাল (চক্র) অর্থায়ন করছে, যারা ১৯৭০-এর দশকে "গ্লোবাল ক্লাইমেট ক্রাইসিস" প্রচারণা শুরু করেছিল তথাকথিত ডিপ স্টেটের জনসংখ্যা হ্রাস ও মানব নিধন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য!

কাবাল

সোনম ওয়াংচুক ১৯৮৮ সালে স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ (SECMOL) প্রতিষ্ঠা করেন। SECMOL-কে অর্থায়ন করছে ফিউচার আর্থ নেটওয়ার্কস।

ফিউচার আর্থ নেটওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠাতা পল শ্রীবাস্তব বর্তমানে

দ্য ক্লাব অব রোম-এর কো-প্রেসিডেন্ট, যা রকফেলারদের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত থিঙ্কট্যাঙ্ক। এই ক্লাবই ১৯৭১ সালে তাদের "লিমিটস অফ গ্রোথ" রিপোর্টের মাধ্যমে ক্লাইমেট ক্রাইসিস ও ওভার পপুলেশন প্রচারণা শুরু করে!

দ্য জিগস (ধাঁধা)

সোনম ওয়াংচুকের SECMOL-এর আরেক পার্টনার Karuna.org। কারুণা ইউএসএ (Karuna USA) – যা কারুণা ফাউন্ডেশনের মার্কিন শাখা – সরাসরি ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে যুক্ত! ইভন চেন, কারুণা ইউএসএ-এর ডিরেক্টর, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের BUILD প্রোগ্রাম চালান!

সোনম গ্রেফতার হওয়ার পর সোনমের স্ত্রী'র পাশে কংগ্রেসি আইনজীবীরা।

দ্য ট্রেইল

ফোর্ড ফাউন্ডেশন ২০০৯ সাল থেকে শুধুমাত্র মিডিয়া ইমপ্যাক্ট ইনিশিয়েটিভসের জন্য ভারতে ১৬২টি অনুদান দিয়েছে, সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থায়নও করেছে! তাহলে চিন্তা করুন—

এই টাকা কোথায় গেল? অবশ্যই গরিবদের হাতে নয়, বরং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ আর দুর্নীতিগ্রস্ত অ্যাক্টিভিস্টদের হাতে, যেমন সোনম ওয়াংচুক।

৩৮,৯০০,০০০.০০ মার্কিন ডলার = ৩,২৬৬,৪১৩,০০৫.৪০ ভারতীয় টাকা। এই বিপুল অর্থের কী হলো? নিজেরাই খুঁজে দেখুন ২০১৪ সাল থেকে হওয়া সমস্ত প্রতিবাদ আর নন-প্রফিট ও থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো— যেখানে ফোর্ড ফাউন্ডেশন অর্থায়ন করেছে—জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া থেকে শুরু করে নিরন্তর (সাবা নকভির বোন ফারাহ নকভির ট্রাস্ট), মহাত্মা গান্ধী সেবা আশ্রম থেকে রতন টাটা ট্রাস্ট পর্যন্ত!

দ্য ব্রাদার্স ফ্রম আদার মাদারস

সোনম ওয়াংচুকের প্রধান অর্থদাতা ফিউচার আর্থ নেটওয়ার্কস, যা সমর্থিত স্টার্ট ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা। স্টার্ট ইন্টারন্যাশনালকে সমর্থন করছে স্কল ফাউন্ডেশন, যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জেফ্রি স্কল, ebay-র প্রথম প্রেসিডেন্ট। ইবে-র প্রতিষ্ঠাতা পিয়ের ওমিদিয়ার-এর সঙ্গে দুজনেই ইবে তালিকাভুক্ত হলে বিলিয়নিয়ার হন। এবং দুজনেই একই বামপন্থী এজেন্ডা অনুসরণ করেন।

আরেক সমর্থক বেলমন্ট ফোরাম, যা সমর্থিত ইউএস ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন দ্বারা।

কম লোক জানেন যে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনই CIA-এর "দ্য ফ্লাইং মাংকি" প্রকল্পের অধীনে গুগল প্রতিষ্ঠার জন্য সিড মানি দিয়েছিল!

দ্য নেক্সাস

স্টার্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর পিছনে রয়েছে ইউএসএআইডি, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল ও IIHS, যেখানে রোহিণী নিলেকনি, সেবা ভারত-এর রেনানা ঝাব্বালা এবং হরিশ খারের স্ত্রী বোর্ড মেম্বার। একই নেক্সাস ফিউচার আর্থ নেটওয়ার্কস-এর সঙ্গে সংযুক্ত স্টার্ট ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে!

দ্য চাইনিজ স্যুপ

ফিউচার আর্থ নেটওয়ার্কস-এর চীনা হাব—যা সোনম ওয়াংচুকের প্রধান অর্থদাতা—সম্পূর্ণ চিনা কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা আশ্রিত!

দ্য কানেকশন

এই কাবাল খুঁজলে দেখা যাবে এটি সব পথেই নিয়ে যাচ্ছে—দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাস, ইউএসএআইডি, ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও সোরোস প্রক্সিদের কাছে।

দ্য ডিটেনশন

লেহ-এ চলমান অশান্তির মাঝখানে 'অ্যাক্টিভিস্ট' সোনম ওয়াংচুককে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি উসকানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে ভিড়কে প্ররোচিত করেছিলেন। বিতর্কিত এই ব্যক্তিকে লেহ পুলিশ গ্রেফতার করে। খবর অনুযায়ী তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (NSA) এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়।

এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MHA) সোনম ওয়াংচুকের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL)-এর FCRA লাইসেন্স বাতিল করে, এনজিও-র বিদেশি তহবিল গ্রহণে ভারতের আইন লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে। এই সিদ্ধান্ত আসে ঠিক একদিন পর, যখন লেহ-তে রাজ্যের মর্যাদা চাওয়া নিয়ে সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে হওয়া বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়।

কেন্দ্রীয় সরকার সোনম ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে তিনি তাঁর বক্তৃতায় "আরব বসন্ত ধাঁচের আন্দোলন" এবং "নেপালের জেন জেড প্রতিবাদের" মতো ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, লাদাখে ২৪ সেপ্টেম্বর পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যখন রাজ্যের মর্যাদা ও ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে চলা প্রতিবাদ সহিংসতায় পরিণত হয়। সংঘর্ষে

সোনমের উসকানিতে লাদাখের রাস্তায় উন্মত্ত কংগ্রেস নেতাদের দাপাদাপি।

অন্তত চারজন প্রাণ হারান এবং ৬০ জনেরও বেশি আহত হন। ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা স্থানীয় বিজেপি কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বেশ কয়েকটি গাড়িও পুড়িয়ে দেয়।

লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার যাবে না কেন?

১. আইনগত ও প্রশাসনিক বাধা:

গৃহ মন্ত্রণালয় (MHA) জানিয়েছে, লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আনতে হলে সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন, যা একটি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সংবিধান অনুযায়ী, ষষ্ঠ তফসিল কেবলমাত্র ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য সংরক্ষিত, অন্যদিকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতি এলাকা পঞ্চম তফসিলের আওতায় পড়ে।

২. সিদ্ধান্তগ্রহণে সম্ভাব্য বিলম্ব:

অনেকের মত, লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করলে প্রশাসনিক কাঠামো আরও জটিল হয়ে উঠবে, যার ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণে বিলম্ব এবং শাসন ব্যবস্থায় সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

৩. উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা চলছে:

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সংসদের এক স্থায়ী কমিটিকে জানিয়েছে যে, ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্তির মূল উদ্দেশ্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন ইতিমধ্যেই এই কাজ করছে এবং কেন্দ্র সরকার পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করছে যাতে লাদাখের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

৪. সংরক্ষণ বৃদ্ধি:

রাজ্যসভায় উপস্থাপিত এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, লাদাখ প্রশাসন সরাসরি নিয়োগে তফসিলি উপজাতি (Scheduled Tribes)-দের জন্য সংরক্ষণ ১০% থেকে বাড়িয়ে ৪৫% করেছে। এই পদক্ষেপ উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি:

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে লাদাখে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে (যেমন রাস্তা, বিমানবন্দর, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তি লাদাখের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ এতে ভূমি ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং বিনিয়োগের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপিত হতে পারে।

৬. স্পষ্ট প্রশাসনিক শৃঙ্খল:

লাদাখে বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের নিয়োজিত লেফটেন্যান্ট গভর্নর সরাসরি শাসন পরিচালনা করেন। এর ফলে অঞ্চলে নিরাপত্তা কার্যক্রমে একটি স্পষ্ট নির্দেশনার শৃঙ্খল বজায় থাকে, যা সেনা, আধা-সেনা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় স্থাপন করে— বিশেষত চীনা অনুপ্রবেশের মতো পরিস্থিতিতে।

৭. সার্বভৌমত্বের দৃঢ়তা:

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে লাদাখের বর্তমান মর্যাদা ভারতের সার্বভৌমত্বকে আরও শক্তিশালী করে। এটি চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংক্রান্ত কূটনৈতিক আলোচনায় ভারতের অবস্থানকে দৃঢ় করে তোলে।

দুই দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় পর্বে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত মঙ্গোলিয়ার প্রখ্যাত 'মরিন খুউর' অর্কেস্ট্রা-র অনুষ্ঠানে মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি খুরেলসুখ উখনা ও বিজেপি জাতীয় সভাপতি শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

নয়াদিল্লিতে মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি খুরেলসুখ উখনা-কে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং-এর উষ্ণ অভ্যর্থনা।

হরিয়ানার মানেসারে এনএসজি-র ৪১-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

কৃষককল্যাণ, স্বনির্ভরতা এবং গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কৃষক ভাই বোনেদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে 'সর্দার@১৫০ একতা মার্চ' শীর্ষক কর্মশালায় বিজেপি জাতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে বিজয়াদশমী উপলক্ষে রাবন দহন অনুষ্ঠানে বিজেপি জাতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

NEXT GEN GST

মহিলাদের জন্য ব্যবসা এখন আরও

সহজ,দ্রুত ও স্মার্ট

এখন জিএসটি রেজিস্ট্রেশন মাত্র ৩ দিনেই সম্পন্ন হয়

৯০% রিফান্ড সরাসরি আগেই দেওয়া হয়

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোর (MSME) খরচ কমেছে

প্রতি ৫ জন জিএসটি ব্যবসায়ীর মধ্যে ১ জন নারী উদ্যোক্তা। নতুন GST 2.0 মানেই বেশি সুযোগ ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এক নতুন দিগন্ত।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।